ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া,

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ 5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং পুরাণ প্রেস, 21 বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা 700 004 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত ইংরেজ পরিবারে উপন্যাস পড়া একটা দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। বাড়ির বড়মেয়ে অথবা মেজছেলে উপন্যাস পড়ত। তাকে ঘিরে বসে বাড়ির সবাই শুনত। তখনকার দিনে সিনেমা বা রেডিও ছিল না। নাটক হত। তবে সেই নাটক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব হত না। কালে ভদ্রে সম্ভব হলেও প্রত্যেক দিন নাটক দেখা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাই, উপন্যাস পড়া, শোনা এবং শোনানোর মধ্যেই আনন্দ পেতে হত।

স্যার ওল্টার স্কট ইতিহাস ভিত্তিক ও চার্লস ডিকেন্স সামাজিক জীবনের ভিত্তিতে লেখায়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জীবন বিধৃত হয়েছে তাদের উপন্যাসে। ক্রমশ সামাজিক জীবন থেকে রোমান্টিক জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে ইংরেজি উপন্যাসে। এই রোমান্টিক জীবনকে আবার বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ইংরেজ ঔপন্যাসিকগণ। ঘটনা প্রধান উপন্যাস লিখেছেন গল্স্ ওয়ার্দি। একটার পর একটা গিঁট দিয়ে জট পাকিয়ে শেষে আবার প্রতিটি গিঁট খুলে অন্য ধরনের উপন্যাস রচনায় ব্রতী হলেন জোসেফ কনরাড। ভালবাসার বন্ধন ভিত্তিক উপন্যাস রচনা করলেন টমাস হার্ডি। দূর এবং অদূর ভবিষ্যৎ ভিত্তিক কথা-সাহিত্য রচনা করলেন এইচ. জি. ওয়েলস্।

ইংরেজি উপন্যাস জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ডি এইচ. লরেন্স। তখন পর্যন্ত কথা সাহিত্য যেন একই জায়গায় ঘুর পাক খাচ্ছিল। বহির্জগতের সঙ্গে চরিত্রের অহরহ যে দ্বন্দ্ব হয় সেই দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করাই শিল্পীর কাজ। বললেন লরেন্স। ফলে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে

নতুন আঙ্গিক ও বিষয় বস্তুর আমদানী ঘটল। উপন্যাসে যতই কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হোক না কেন তা প্রয়োজনের তাগিদে এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়োজনে জীবন ধর্মী হতে বাধ্য হল।

জীবন ভিত্তিক উপন্যাস রচনার যে বিজয় কেতন ইউরোপ ও ইংলণ্ডে উড়েছিল তার হাওয়া লেগেছিল আমেরিকায়। আমেরিকার দিকপাল কথা সাহিত্যিক দু একজন নয়, পঁচিশ জনেরও বেশি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জেমস কুপার, নেথানিয়াল হথর্ণ, হেনরি জেমস, মার্ক টোয়েন, স্টিফেন ক্রেন, জ্যাক লণ্ডন, শেরউড এণ্ডারসন, সিন ক্লেয়ার লুইস্, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, টমাস উল্ফ, উইলিয়াম ফকনার প্রমুখ প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ছিল কথা, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে।

ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া একজন বিশ বছরের যুবক নিজেকে লেখক হওয়ার যোগ্য করে তুলতে চাইলেন। দশ বছর ধরে চর্চা চলল শব্দ বানান এবং বাক্য গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে। লিখলেন উপন্যাস। পাঠালেন প্রকাশকের কাছে। তিনটি নাম দিলেন। প্রথম নাম 'সাকসেস,' দ্বিতীয় নাম 'স্টার ডাস্ট,' তৃতীয় নাম 'মার্টেন ইডেন'। প্রকাশকরা শেষ নামটি গ্রহণ করলেন। সেটাই জ্যাক লণ্ডনের বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস।

একই ভাবে হেমিংওয়ে লিখলেন, 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস্' ১৯২২ খৃস্টাব্দে। হেমিংওয়ের স্ত্রী প্যারিসে ঐ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ব্যাগে পুরে নিয়ে যাওয়ার সময় সেটি চুরি হয়ে যায়। হেমিংওয়ের স্ত্রী এত যত্নে ঐ ব্যাগটিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন যে চোর ভেবেছিল ঐ ব্যাগেই বুঝি মূল্যবান গয়নাগাটি কিছু আছে। সেই পাণ্ডুলিপি দিয়ে কোন গৃহিনী হয়ত দুধ গরম ক'রেছিল অথবা চোর নিজেই সেটি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনার ছ বছর পরে হেমিংওয়ে আবার লিখলেন। নাম দিলেন 'এ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস্'। বিশ্ববিখ্যাত এই উপন্যাস পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।

এই শতকের তিরিশ দশকে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তেলুগু ভাষায় লিখিত উপন্যাসের প্রতিযোগিতা করলেন। একটার পর একটা বাছাই করার

পর শেষ পর্যন্ত টিকল তিনটে। বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের 'ওয়েরি পডগু,' অডিবি বাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও' এবং গুডিপাটি ভেঙ্কট চলমের 'ময়দানম'। (বাংলায় অনুবাদ করেছেন বোম্মানা বিশ্বনাথম্)। প্রথম দুটি উপন্যাস পুরস্কৃত হয়। এই দুটি উপন্যাসের সমপর্যায়ের আর একটি উপন্যাস হল উন্নভ লক্ষ্মীনারায়ণের 'মালপল্লী'।

পত্র পত্রিকায় পড়ার জিনিস চাই। পড়ে মজা পেতে হবে। ভাল লাগাতে হবে। তাই পত্র পত্রিকার সম্পাদকরা শুধু সংবাদ নয় গল্প উপন্যাসও প্রকাশ করতে লাগলেন। তাই কাগজে কাগজে ছোট গল্প বেরোতে লাগল। উপন্যাস ছোট গল্পকে টেক্কা দিতে পারল না। ফলে উপন্যাসের চর্চা কমে গেল। তাই ইদানীং মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে: এটা কি সিনেমা দেখে লেখা হয়েছে, না কি সিনেমার জন্য লেখা হয়েছে?

আজ কম বেশি একশ বছর হতে চলল তেলুগু উপন্যাসের বয়স। গোল্ডস্ স্মিথের 'দি উইকার অফ্ ওয়েকফিল্ড' অবলম্বনে কান্দুকুরি বীরেশ লিঙ্গম্ রচিত 'রাজশেখর চরিত্রমু' (১৮৭৮) তেলুগু ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। ব্রাহ্ম সমাজের মতাদর্শে নারীর উদ্ধার কল্পে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজশেখর ভূস্বামী তত্ত্ববেত্তা হলেও, বীরেশ লিঙ্গমের রচনায় সামাজিক জীবন চেতনা উন্নত না করে পারেন নি। এই উপন্যাসের পরে যেটির নাম করতে হয় সেই উপন্যাসের নাম 'রামচন্দ্র বিজয়মু' (১৮৯৪)। এক গরিব ব্রাহ্মণ যুবক ইংরেজি শিখে, চাকরি জোগাড় করে কি ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করল সেটাই হল ঐ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। তারপর টানা পঁচিশ বছরের মধ্যে আমরা কোন উপন্যাস পাই না। চিলিকামার্তি নরসিংহম্ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজরত্নমু' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর 'আত্মবলি', ভেঙ্কট পার্বতীশ্বরদ্বয়ের 'মাতৃমন্দিরমু' প্রকাশিত হওয়ায় উপন্যাস ভাণ্ডারে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয়। এই সময় পর্যন্ত সমাজ সংস্কার মূলক চরিত্র ও ঘটনাই আমরা উপন্যাসে পাই। তবে গান্ধীর উদ্যোগে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল তার পটভূমিকায় ভেল্লুরি

শিবরামশাস্ত্রীর 'ওরাইয়া', উন্নভ লক্ষ্মীনারায়ণের 'মালপল্লী' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মালপল্লী পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়ে আজ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলেও এর প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা আজও অন্ধ্রের বিভিন্ন প্রান্তে দেখতে পাওয়া যায়। সেদিনের সমস্যার আজ কিছু সমাধান হলেও তার ছায়া সামাজিক জীবনে মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। রাজনৈতিক জীবন থেকে তার দোর্দণ্ড প্রতাপ এখনও লুপ্ত হয়নি। তারপর তিরিশ দশকের উপন্যাস বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের 'ওয়েয়ি পড়গুলু।' ইতিহাসের অতল গহ্বরে এখনও ডুবে যায়নি। অড়িবি বাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও' (বাংলায় অনুবাদ করেছেন বোম্মানা বিশ্বনাথম্)। জমিদারী ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থার দিকে পা বাড়িয়েছে। ঠিক সেই সময় গুড়িপাটি ভেঙ্কটচলম্ নতুন আলোর ঝলকানিতে তেলুগু উপন্যাসে বাস্তব জীবনের এক মারাত্মক দিক উদ্‌ঘাটন করলেন। নারীকে দাসী বানিয়ে রাখার ফলে পুরুষের পতনই যে ত্বরান্বিত হচ্ছে তা তিনি পরিষ্কার ভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। অর্থনৈতিক সংকট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তেলুগু ভাষীকেও নাড়া না দিয়ে পারেনি। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা পাই কোডাওয়াটি গান্টি কুটুম্বরাওয়ের 'চাতুই', ত্রিপুরানেনি গোপিচন্দের 'অসমর্থুনি জীবন যাত্রা' ও জি. পি কৃষ্ণারাও রচিত 'কীলু-বোম্মালু' উপন্যাসত্রয়। বুচ্চিবাবুর 'চিওয়ারিকি মিগিলেদি' উপন্যাসটি বেরোনোর ফলে তেলুগু কথা সাহিত্যে চরিত্রগুলোর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়।

শ্রী পালগুম্মি পদ্মরাজু তাঁর 'গালিওয়ানা' (ঝড়) নামক গল্প আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের পর, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, বেতার নাটক রচয়িতা, চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে নানা ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়ে তিনি যেমন বলতে পারেন তেমনি লিখতে পারেন। সর্বাধুনিক সমাজকে উদ্‌ঘাটিত করাই তাঁর লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'রামরাজ্যানিকি রাহাদারি' উপন্যাসটিতে তেলুগু মধ্যবিত্ত জীবন

অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিতে রূপায়িত হয়েছে। পঁচিশ তিরিশ বছরের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্ত জীবন পর্যুদস্ত হচ্ছে তার নিখুঁত চিত্র পাই এই উপন্যাসে।

উপন্যাসগুলোর মধ্যে নাল্লা রেগাড়ি (মাটির রঙ কালো) এক বিশেষ সযত্ন প্রয়াস। ঘটনার সন্নিবেশ এমন সুন্দর ভাবে ঘটেছে যে প্রত্যিটি চরিত্রকে পরিষ্কার চেনা যায়, জানা যায়। কোন ঘটনাই কাল্পনিক মনে হয় না। বর্ণনার মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। ফাটা ক্ষেত তৃষ্ণায় হাঁ করে রয়েছে। রোদ মাটিকে তৃষিত করছে। তৃষ্ণার্ত হওয়া জীবনের লক্ষণ। সেই তৃষ্ণা মাটিকে সীমাহীন শক্তির অধিকারী করে তোলে। দূষিত হাওয়া থেকে প্রাণ ধারণের হাওয়া টেনে নেওয়ার শক্তি জোগায়। সেই শক্তির জোরে মাটিতে ফলে সোনার ফসল।

তিরিশটি লাঙল, টানা তিনদিন কাজ করে, যতটা জমি চষতে পারে—একদিনেই চষে ফেলবে এটা। রাজু নতুন ট্রাক্টর কিনে বলল। ঐ রাজুকে ভালবেসেছিল দুজন। এই বাড়ি, এই ক্ষেত, এই সব ছেড়ে যাব কোথায়? চলে গেলে গরুকে জাব দেবে কে? নেবু গাছের গোড়ায় কে জল ঢালবে? এসব মল্লির ভাল লাগে। গরু আর গাছ তাকে যে ভালবাসে। মল্লি ভাবত। ঐ লোচ্চা বাওয়া হলেই, আমার চলবে যখন বলেছিলে, তখন সে লোচ্চা ছিল না? এখন লোচ্চা হল? তোমরা পুরুষেরা মন বুঝতে চাওনা, শরীরটাই মুখ্য। …আমার জন্য কাউকে কারও পায়ে পড়তে হবে না।…একজনের মাথা আর একজন কাটিয়ে তোমরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ কর। বলল লক্ষ্মী তার বাবাকে। লক্ষ্মীর সঙ্গে রাজুর বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যখন ঠিক হয়ে এল তখন পণ নিয়ে বিবাদ দেখা দিল। মল্লি চিঠির আদান প্রদান করে। সেই চিঠিগুলো যেন তারই জীবনের পথ রক্ত পিচ্ছিল করে তোলে।

খাটিয়ার উপর বসে ছিল মাজি। তার কাছে এল ধর্মরাজু। আর এল তার ছেলে লিঙ্গরাজু। লিঙ্গরাজুকে ঘরে আটকে রাখলে সেই সুপুত্র, বাপকে বলল, মরার আগে মায়ের নামে জীবন বীমা করিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করে নিলে। এখন পঞ্চাশটি টাকা চাইলে

তোমার মুখ খুলে যায়। বাপ আর ছেলে দুজনকেই মাজি নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার করে। বিচ্ছু স্বভাবের লোক ছিল ধর্মরাজু। এদের চক্রান্তে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তারই পরিণতিতে মল্লিকে মা দুর্গার মধ্যে লীন হয়ে যেতে হল।

গ্রামের পরিবেশে সুব্বাইয়া, রামাইয়া, ভেঙ্কায়া, গঙ্গাম্মা, রঙ্গা, রামী, সুরালু প্রভৃতি চরিত্রগুলো কোন বড় কথা বলেনি। ওরা সহজ সরল কথায় নিজেদের মন মেলে ধরেছে। এরা কেউ তর্কবাগীশ নয়। কেউ উপদেষ্টাও নয়। নিজেদের দোষ ঢাকার কোন চেষ্টা নেই এই চরিত্র-গুলোতে। ওদের যারা অপমান করে তাদের পাল্টা অপমান করাই উচিত মনে করে ওরা। যুগ যুগ ধরে যে পশুবলি হয় সেটা তাদের কাছে ভুল মনে হয় না। পুরুষানুক্রমে যে সব আচার ব্যবহার চলে আসছে সেগুলোর মধ্যে ওরা খারাপ কিছু দেখতে পায় না। চাষের জন্য ট্রাক্টর আনার পর থেকে শুরু হয়েছে এই উপন্যাস। বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে চরিত্রগুলো হয়েছে মূর্ত। এক দ্বন্দ্ব আর এক দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। বিরোধ তীব্রতর হয়েছে। কখনো বা সেই বিরোধ রক্ত ঝরিয়েছে আবার কখনো ভালবাসায় পরিণত হয়েছে।

আমি উপন্যাস রচয়িতা হওয়ায়, বৈজ্ঞানিকের চেয়ে, তত্ত্ববাগীশের চেয়ে, কবির চেয়ে অধিক কিছু নিজেকে মনে করি। তার কারণ ওরা যে যার ক্ষেত্রে বিচরণ করে। ওদের প্রত্যেকের মধ্যে যা আছে তার কিছু কিছু আছে আমার একার মধ্যেই। প্রকাশমান জীবনের সার কথাই হল উপন্যাস। বললেন লরেন্স।

পল্লরাজু জীবনের ঐ ধরনের সার কথাকেই 'নাল্লা রেগাডি' (মাটির রঙ কালো) উপন্যাসে বিধৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

এন. আর. চান্দুর

মাটির রঙ কালো

পায়ের নিচের মাটি যেন গনগনে আগুন। বৃষ্টির সময় পা ধুয়েও কাদা ছাড়ানো যায় না। যত জল দিয়ে ধুই না কেন জলটাই খরচ হয়, মাটি গোলা জলই ঝরতে থাকে।

বৃষ্টির সময় ছেলেমেয়ে কালো মাটি মেখে একাকার হয়ে যায়। মাটির সঙ্গে বাচ্চাদের সম্পর্ক কত গভীর। বাচ্চাদের মনের মতই মাটিও তখন থাকে নরম। বৃষ্টির সময় মনও থাকে ঠাণ্ডা।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ে। একটু আধটু রোদের বাহার। হাল্কা রোদে শুকোতে থাকে মাটি। বাচ্চারা তখন ঐ নরম মাটি দিয়ে গুলি বানায়। আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে মাটির ঢেলা খুঁটে খুঁটে বের করে। কচি কচি আঙুল দিয়ে ছোট ছোট দলা পাকায়। চুবড়িতে সাজিয়ে রোদে রাখে। তারপর সেইগুলি নিয়ে খেলে। নরম মাটি দিয়ে গুলি বানায়। নরম রোদে শুকোতে দেয়। বাগ্দীদের বাচ্চাদের কাছে ঐ গুলি হলো গুলতির অস্ত্র। গুলতিতে লোহার গুলির পরিবর্তে ঐ গুলি দিয়ে কাক মারে। বাগ্দীরা গুলতি দিয়ে কাক মারতে ওস্তাদ।

নরম রোদ কড়া হচ্ছে। মাটি হাঁপাচ্ছে। নরম মাটির বুকে মানুষ আর পশু পায়ের ছাপ ফেলে হাঁটে। শুকোতে থাকে মাটি। ঐ ছাপ ফুটে ওঠে। এক এক জায়গায় শক্ত মাটি ছুঁচের মুখ হয়ে থাকে। তার উপর পা পড়লেই মানুষের কান্না পায়। পায়ে যাতে ব্যথা না পায় তার জন্য জুতো পরে পয়সাওয়ালারা। যাদের জুতো কেনার মুরোদ নেই, গাঁয়ের মানুষ, কোটি কোটি মানুষ, খালি পায়েই হাঁটে। ব্যথা পেতে পেতে, কষ্ট সহ্য করতে করতে তাদের

পা কষ্ট সইতে পারে। ক্রমশ পাগুলো যেন অসাড় হয়ে যায়। কোন কষ্টই বুঝতে পারে না। পশুদের পায়ের নিচে যেমন একটা অসাড় অংশ থাকে তেমনি গ্রামের মানুষের পায়ের নিচেও অসাড় অংশ তৈরি হয়ে যায়। পায়ের কোন স্পর্শকাতরতা থাকে না। সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন অনুভূতিই থাকে না গ্রামের মানুষের পায়ে। পশুদের মতই গাঁয়ের মানুষও ফুটি-ফাটা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যায়। শক্ত মাটির ছুঁচোল মুখ তাদের পায়ে ঢুকতে পারে না। কষ্ট টের পায় না গাঁয়ের মানুষ আর পশু।

শুকনো মাটি যেন বুক ফাটিয়ে মুখ হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাটির জিভ শুকিয়ে যেন ভেতরে টেনে গেছে। গাছের শেকড়গুলোকে তৃষ্ণার আগুনে পুড়িয়ে ফেলছে মাটি। আগে শেকড় পোড়ে তারপর গাছ ঝলসে যায়। কিন্তু মাটি মরে না। কোনদিন সেটা মরে না। কবে কোন্ কালে মাটি পান করেছিল অমৃত। তাই তার মৃত্যু নেই। সে অমর। মাটি আকাশের দিকে মুখ হাঁ করে ঘোর তপস্যা করে। ঐ তপস্যার উত্তাপে জগৎ সংসার পুড়তে থাকে। তাপের উগ্রতা বাড়ার ফলে জীবজগৎ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে।

তারপর মাটির তপস্যার ফল দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বৃষ্টি শুরু হয়। হাঁ করে পেট ভরে, বুক ভরে, মাটি পান করে বৃষ্টির জল। হাওয়া আর জল থেকে মাটি টেনে নেয় নেশার জিনিস। মাটি এই সব পান করে নেয় আকণ্ঠ। পৃথিবীকে আর এক বছর বাঁচিয়ে রাখার সামগ্রী মাটি দান করে যায়। জগতের মানুষ আর পশুর বাঁচার খোরাক সে জোগায়।

বাচ্চা ও মাটির মধ্যে সম্পর্ক গভীর। বয়স্কদের হাতে মাটির ঢেলা হল শিশুর মত। রোদ মাটিকে দেয় তৃষ্ণা। সুস্থ থাকার তৃষ্ণা। ঐ তৃষ্ণা প্রচণ্ড শক্তি জোগায় মাটিকে। জল থেকে, বাতাস থেকে জীবন রস টানার শক্তি পায় মাটি। তারপর মাটি সোনা ফলায়। মাটির মত শিশুদের মধ্যেও আছে অনন্ত পিপাসা। সেই তৃষ্ণা আনে ঠাণ্ডা বৃষ্টি। বৃষ্টি পড়লে চাষীরা সোনা ফলায়। মাটির মতই,

বৃষ্টির জল পড়লে, গাঁয়ের মানুষের বাচ্চা হয়—। একশো বছর বাঁচার আশায়।

শিশুদের চাই,
মাটির চাই,
বৃষ্টি ;
চাই ঠাণ্ডা বৃষ্টি
যদি না হয় বৃষ্টি
হয় যদি অনাবৃষ্টি
মাটির যদি থাকে তৃষ্ণা
আর শিশুর থাকে পিপাসা
কি হবে গ্রামের দশা ?
কি হবে বিশ্বের আশা ?

এবড়ো খেবড়ো মাটি। উঁচু আর নিচু। বাঁ দিকের টিপিটা হঠাৎ নেবে গেল। লোকটা ডাইনে বাঁয়ে ঢলে না পড়ে চালাতে পারে ট্রাক্টর। উঁচুতে ওঠা আর নিচুতে নাবার কায়দাও জানা আছে তার। তার হাতের খেলা সব। সে জানে কি ভাবে চালাতে হয় ট্রাক্টর। প্রথমে হাতের কব্জির জোরে টানতে হয়। সেই টানে ট্রাক্টরের চাকা পাক খায়। কি ভাবে অতি সহজে চাকার ঘোরা-ফেরা করানো যায় তা শিখে নিয়েছে তার হাত।

বাচ্চা বয়স থেকেই যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করত রাজু। ঘড়ি আর গ্রামোফোন খুলে খুলে দেখত সে অল্প বয়স থেকে। খোলার সময় সহজেই খুলে ফেলত কিন্তু ঠিকমত জোড়া দিতে পারত না। আধ ঘণ্টায় যা খুলে ফেলত তা ছদিন ধরে হিমসিম খেয়ে জুড়ত। আগে যন্ত্রপাতি কলকব্জা তার কাজে বাগড়া দিত। তার কথামত বসত না। এখন যত নতুন ধরনের গাড়িই হোক-না কেন হেলায় সে সারাতে পারে। খুলে জুড়তে পারে। এখন সে যা বলে তাই, এমন-কি, ট্রাক্টরও শোনে।

'ওহে বাওয়া,' (শ্যালক বা ভগ্নিপতি) ডাকল গঙ্গাপ্পা। গোটা গতর,

নাড়িয়ে ছুটে গেল সে। ষোড়ার মত হাঁটা তার। সে হাঁটার আছে প্রচণ্ড উৎসাহ কিন্তু গতি নেই।

হাতের মুঠোয় ট্রাক্টরের টপ্ টপ্ টর টর আওয়াজ ওঠে। রাজার মত বসেছিল রাজু। একটা কাঠের সীটে। তিরিশ জোড়া বলদ, তিরিশটা লাঙল কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে রইল ঐ ট্রাক্টরের দিকে। তার দিকে।

টুর-র-র শব্দ করে ট্রাক্টর থামাল রাজু। মুহূর্তে সব নিস্তব্ধ। গাঁয়ের ক্ষেতের সব সময়কার নিস্তব্ধতা। রাজু নাবল কাঠের সীট থেকে।

তিরিশটা লাঙল তিন দিন ধরে যতটা কাজ করে তা একদিনে করে ট্রাক্টর। দম থাকলে আরও। বীজ বপন করে, ফসল কাটে। ট্রেলারে ঢেলে দিলে ধান বাড়ি পৌঁছে দেয়। নতুন ধরনের যন্ত্র।

'বাপরে!' বলল গঙ্গাম্মা। তার বড় বড় চোখগুলো ছানাবড়া করে যেন হেসে উঠল। মজার জোয়ার এল তার চোখে। সেই চাউনিতে ফুটে উঠেছিল অবাক হওয়ার চিহ্ন। কিন্তু সেই চাউনিতে কোন বুদ্ধির দীপ্তি নেই। চালাকির ছাপ নেই। তার গভীরে আছে একটি বিরাট হৃদয়। গঙ্গাম্মার দেহের মতই তার মনটাও ছিল বিরাট। গঙ্গাম্মার দিকে তাকালে গাঁয়ের দিঘির কথা মনে পড়ে রাজুর। পদ্মফুল আর পাতায় ভরা দিঘি। দিঘির আরশিটাকে ভেঙে ফেলে পদ্মপাতাগুলো। তবু গোটা আকাশটা দিঘির ঐ ভাঙা আরশিতেই প্রতিবিম্বিত হয়। গোটা আকাশের মতই গঙ্গাম্মার চোখে তার মনের আকাশ প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল।

'তোমার উনি এসেছেন গো'! মল্লি মহানন্দে তেঁতুল পাতা পাড়তে পাড়তে বলল।

'মরণ আর কি, আমার উনি কি গো? ওতো তোমার বাওয়া।' বলল লক্ষ্মী।

'আজ না হোক কাল। কাল কি আর সে তোমার উনি হবে না?' বলল রামী আর এক ছোট ডাল থেকে পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে। লক্ষ্মীর ঠোঁট নড়ে উঠল। চোখে মুখে আশার ছাপ ফুটে উঠল।

ওগুলো যেন 'হাঁ' বলছে। চোখের চাউনিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যে! কবে কতদিন পরে হবে কে জানে!

'ওগো মা লক্ষ্মী, রাজু বাওয়া এসেছে!... বিরাট যন্ত্র চালাতে চালাতে এসেছে! ... কি যেন ছাই তার নাম। তিরিশটা লাঙলের তিন দিনের কাজ'...আনন্দে আর বলতে পারল না গঙ্গাপ্পা। হাঁকপাঁক করে তাড়াতাড়ি এল। শরীরে কুলোয় না তার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি এল। লাঙল ধরা শক্ত হাত দুটো তুলে ছুটতে ছুটতে হাজির হলো। হাঁটার মত ছোটা। এসে দুবার বুক ভরে প্রশ্বাস নিয়ে আবার বলতে যাবে এমন সময় তেঁতুল পাতার একটি বোঝা উপর থেকে পড়ল।

'একটু জিরিয়ে নাও গো ছোটবাবু। একটু দম নিয়ে নাও।'

'তেঁতুল পাতার বাহার দেখ, ছোট মেয়ের বড়াই দেখ।' বলতে বলতে মাথা তুলে উপরের দিকে তাকাল গঙ্গাপ্পা। তেঁতুল গাছের আলো-আঁধারি ফাঁক দিয়ে রামীর কালো মসৃণ পা দেখা যাচ্ছিল। আরো উপরে অল্প কাপড়ে ঢাকা, হাঁটুর উপর বাঁধা, কাপড়ের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তার মসৃণ উরু। গঙ্গাপ্পা চমকে উঠে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। রামীর সুন্দর টোল খাওয়া গালের দিকে তাকালে গঙ্গাপ্পার চোখ ট্যারা হয়ে যায়। মাথা বন্ বন্ করে ঘোরে। গঙ্গাপ্পার গোটা মুখটাকে উপরের দিকে রেখে তাকাল। কালো মুখের দুটো চোখ চিক চিক করে আর উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলো যেন উপরের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। ওর মুখে চুট্টা দেখে তার ভাবনাচিন্তা গুলো কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে দাঁড়িয়ে পড়ল গঙ্গাপ্পা।

'পা হড়কে মাটিতে পড়ে যাবে। একটু সামলে।' বলল গঙ্গাপ্পা। চোখগুলো তার এদিক ওদিক ঘুরছে। মুখ দিয়ে যা বেরুচ্ছে তাতে ঠোঁট নড়ছে কিন্তু আওয়াজ বেরুচ্ছে না গঙ্গাপ্পার।

'তুলোর বস্তার মত তুমি তো নিচে আছ গো। পা হড়কালে মাটিতে পড়ব কেন? তোমার ঘাড়েই পড়ব।' বলল রামী।

মল্লি বিড়ালের মত তর তর করে গাছ থেকে নামল। তা দেখে গঙ্গাপ্পার গলা শুকিয়ে গেল।

'হাঁ হাঁ হাঁ কর কি কর কি আস্তে নাব না কেন। তুই কেন উঠতে গেলি বোন?' বলল গঙ্গাপ্পা।

মল্লি কোন কথা বলল না। মাথায় করে আনা কচি তেঁতুল পাতা নিচে ফেলল।

'এটা আর ওটা ঝুড়িতে তুলে রাখ তো দাদা। এক্ষুনি আসছি।' বলে পাখির মত উড়ে গেল মল্লি। শ্বেত কপোতের পাখার মত উড়তে লাগল তার গায়ের কাপড়। আলের উপর দিয়ে সে ছুটতে লাগল। যে কোন ক্ষেতের উপর দিয়ে টেনে ছুটতে পারে মল্লি। ছোটে না উড়ে যায়। বোনের ছোটা দেখে গঙ্গাপ্পার মন আনন্দে ভরে যায়। চোখ বুজে আসে। মাখনের মত চোখগুলো দলা পাকিয়ে ঝিমিয়ে যায়।

লক্ষ্মী তেঁতুল গাছের ডাল ধরে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। তার দৃষ্টির নাগালের মধ্যে ট্রাক্টর। নাগালের বাইরে রাজু।

মল্লির দিকে তাকাতে তাকাতে গঙ্গাপ্পা চমকে উঠল। রামী নিচের এক ডাল ধরে ওর পাশে দুলতে লাগল। গঙ্গাপ্পা চমকে পড়ে যেতে গেলে তাকে ধরে ফেলল দুটো ঠাণ্ডা হাত। ঐ ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে হতবাক হয়ে গেল গঙ্গাপ্পা। প্রাণখোলা প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল রামী।

'আমি কি ভূত না পেত্নী? অমন করে চমকে উঠলে কেন গো ছোটবাবু?' বলল রামী।

গঙ্গাপ্পা থপাস্ করে মাটিতে বসে পড়ল। রামী তার মাথার উপর কচি তেঁতুল পাতা ঢালতে লাগল। তার মাথার উপর তেঁতুল পাতার টিপি হয়ে গেল।

'উঠুন। তেঁতুল পাতায় গড়িয়ে পাতাগুলোকে আর বাটতে হবে না। চাটনি হয়ে যাবে।' বলল রামী। সে আস্তে আস্তে উঠে গা-হাত-পা ঝেড়ে তেঁতুল পাতা কুড়িয়ে বস্তায় পুরে নিজের কাপড় ঠিক

করে নিয়ে আড় চোখে গঙ্গাপ্পার দিকে তাকাল। পরক্ষণে লক্ষ্মীকে দেখিয়ে সে গঙ্গাপ্পাকে চোখ মারল।

'অত লজ্জা কেন লা লক্ষ্মী? তাকিয়ে দেখ না চোখ ভরে। শহর থেকে সোজা ফিরে এসেছে কি না।' বলল রামী।

'যা অসভ্য!' বলল লক্ষ্মী। মুখ ঝামটা দিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। তেঁতুল গাছ থেকে দূরে গিয়ে থামল। তার চোখে মুখে লজ্জার লাল আবির ছড়িয়ে পড়ল। মুখ না তুলেই সে তাকাতে চেষ্টা করল ট্রাক্টরের দিকে। রাজুর দিকে।

মল্লি ট্রাক্টরের গায়ে হলুদ লাগাল। তার মাথায় কুমকুম পরাল, কদম ফুলের বড় মালা পরাল রেডিয়েটরের উপর। কর্পূর ধরাল। নারকেল ফাটাল। 'জয়' বলল গঙ্গাপ্পা।

রাজু রাজার মত ট্রাক্টরের উপর উঠে বসল। কল টিপল। ডুস ডুস টর টর করে উঠল ট্রাক্টর।

ট্রাক্টর নড়ে উঠল। কালো শক্ত মাটির বুক চিরে চলেছে ট্রাক্টর। এগিয়ে চলেছে ট্রাক্টর। পিছনে পড়ে থাকে বুকফাটা মাটি। মাটির ঢেলা। শক্ত মাটির গুঁড়ো।

'ওমা গো!' বলল রামী। চাকা ততক্ষণে দুবার পাক খেয়ে পেছনের দিকে ফিরে এল ট্রাক্টর।

রামাইয়া, সুব্বাইয়া, রঙ্গা, পুন্নাইয়া, পাদ্দালু, বলদ, কুলিরা চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে।

'বড় কাপুরা ট্রাক্টর নিয়ে এসেছে যে রে, এবার তোদের মুখে ঢুকবে মাটি।'—বলল করণম্ ধর্ম্মরাজু শেকলের এক প্রান্ত ধরে, আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে। শেকলের অন্য প্রান্ত ধরে আছে লিঙ্গরাজু,

ধর্মরাজুর ছেলে। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক্টরের দিকে তাকিয়ে নয়, মাঙ্গাম্মার দিকে তাকিয়ে।

মাঙ্গাম্মার শরীর তেল হলুদ মাখানো। সোনালী রঙের দেহ তার। টানা টানা চোখ। তীক্ষ্ণ নাক। ছোট্ট মুখের হাঁ। পুতুলের মত মাথা তুলে চোখের পাপড়ির ভেতর দিয়ে যেন তাকায় মাঙ্গাম্মা। মাঙ্গাম্মা হাসে না। কখনও হাসে না। কথা বলার সময়, শোনার সময় অল্প অল্প করে মাথা নাড়ে। এমন ভাব করে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে একটা কাজ করছে।

মাঙ্গাম্মা নুয়ে চারা পোঁতার সময় অথবা কিছু কুড়োতে আড় চোখে তাকালে, সেই চাউনি দেখে লিঙ্গাইয়া সব ভুলে যায়। ধর্মরাজুরও একই অবস্থা হয়। মাঙ্গাম্মা বোঝাটি গোল করে, মাথায় তুলে, আলের উপর রাখল। মাঙ্গাম্মার গায়ে জামা ছিল না। শাড়ীটা পিঠ থেকে খসে পড়ে ছিল। কোমর পর্যন্ত সোনালী মাখন সাজানো গোটা পিঠের দিকে তাকিয়ে লিঙ্গাইয়া ঢোঁক গিললো।

মাঙ্গাম্মা সাধারণ ভাবে ট্রাক্টরের দিকে তাকাল। কপালের যেখানে সে কুমকুম লাগায় সেখানে সেদিন পরা ছিল সবুজ কুমকুম। এমন ভাবে সে থাকে যে তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে বিধবা। সে কথা কারো মনে থাকে না। মাঙ্গাম্মা পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেড়েছিল, তারপর থেকে বেড়ে ওঠা বন্ধ করে দিল। বাড়তে না দিয়ে আঁটোসাঁটো করে নিজের বুক বেঁধে রাখল। বাচ্চাদের শরীর বাড়তে থাকে কিন্তু মাঙ্গাম্মার কোন কিছু বাড়ে না, কমেও না।

সেই দৃশ্য দেখে, অন্য জগতের মানুষ ধর্মরাজু, শুনতে পেল অনেকের হাসি। হাসছে মুনসেফ রামাইয়া। সুব্বাইয়া কাপুর ছেলে পুন্নাইয়া— সবাই লুটোপুটি খেয়ে হাসছে। ধর্মরাজুর ধারণা হল তাকে দেখেই বুঝি সবাই ওভাবে হাসছে। কারণ সেও মাঙ্গাম্মার দিকে তাকাচ্ছিল। তার ধারণা হল তার সম্মান বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। কটমট করে তাকিয়ে হেঁকে বলল, 'ওরে লিঙ্গাইয়া, ওখানে আর কতক্ষণ কাটাবি, চট্‌পট্‌ কাজ সেরে চলে আয়।'

লিঙ্গাইয়া মাঙ্গাম্মার পিঠের উপর থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই কী যেন বিড় বিড় করে বলল।

সর্বনাশ একটা কিছু হয়ে যাওয়ার মত ধর্মরাজু আর্তনাদ করে উঠল, 'কি রে, এলি এদিকে!'

'হ্যাঁরে পান্দালু এই পাথরটা কে সরালো! কইরে, কথা বলছিস না কেন? এই পাথরটা এখানে এলো কি করে?' গর্জে উঠে বলল সে।

'আপনিই সরিয়ে থাকবেন। আবার কে সরাতে আসবে এখানে'। হাতের গুলি পাকাতে পাকাতে বলল পান্দালু। ওসব দেখে কেউ তার সঙ্গে তর্ক করার সাহস পায় না।

'তোর অত ডাঁট কিসের? সুব্বাইয়া কাপুর খুঁটির জোরে অত দেমাগ হয়েছে তোর!' বলল ধর্মরাজু।

রাগে গজগজ করতে করতে ট্রাক্টর থেকে লাফিয়ে নিচে নাবল রাজু। তার পা ঘষা লেগে ছড়ে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। মল্লির চোখে পড়ল তা। রাজুর পায়ে তাজা রক্ত। মুহূর্তে সে আঁচল ছিঁড়ে রাজুর পায়ে বেঁধে দিল। মল্লি তার দিকে তাকাচ্ছে দেখে রাজুর রাগ একটু কমল। রাজু মল্লির দিকে তাকালো চাপা হাসি হাসতে হাসতে। তারপর ধর্মরাজুর দিকে ঘুরে বলল, 'কি হে নারদ মুণি, ঐ পাথরটা যেখানেই থাক তাতে তোমার কি? চার হাত আমাদের ক্ষেতেই থাক, তোমার তাতে কি? আমাদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমাদের ব্যাপারে তোমার নাক গলানোর কি দরকার? সব সময় কার সঙ্গে কার ঝগড়া লাগাবে তার ছল ছুতো খোঁজাই তোমার কাজ।'

'আহা,' ধর্মরাজু বলল, 'তোমরা দুই পরিবার এত মিলেমিশে আছ বলেই তো গ্রামে সোনা ফলে।' এই নিয়ে ধর্মরাজু একটা দীর্ঘ ভাষণ দিল। কিন্তু অন্যমনস্কতার ফলে তার হাতের মাপার শেকল নিচে পড়ে গেল। সেটা আপনা-আপনি ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে দেখে ধর্মরাজু তো অবাক। লিঙ্গরাজু শেকলের অন্য প্রান্ত ধরে এমন ভাবে হাঁটছে যেন তার হাতে যে কিছু আছে তা সে ভুলে গেছে।

তার সামনে মাঙ্গাম্মা ঝুড়ি মাথায় হাঁটছে। লিঙ্গরাজুর চোখ দুটো মাঙ্গাম্মার খোলা পিঠ আর নিতম্বে যেন পেরেকের মত বিঁধতে লাগল।

'ওরে লিঙ্গাইয়া,' বলে পেছিয়ে গেল ধর্মরাজু। পেদ্দা কামেন্দুলু, চিন্না পাল্লেলু হো হো করে হাসলেও ওসব কানে তুলল না ধর্মরাজু। কারণ তার চোখগুলো আধবোজা হয়ে নেশাগ্রস্ত মানুষের চাউনির মত হয়ে গিয়েছিল। মাথার উপর রাখা ঝুড়ি বাঁ হাতে ধরল মাঙ্গাম্মা। সেইজন্য বাঁ দিকের আঁচলটা অনেকখানি উঠে গেল।

'হ্যাঁরে এই, কি দেখছিস অমন হাঁ করে। দুপুর হয়ে গেল। কাজ যা হয়েছে তা মা ভগাই জানে। একটা দিকেরও পুরো কাজ হল না' গর্জে উঠল মুনসেফ, রাওয়াইয়া। চাকরগুলো আবার লাঙলে হাত দিল।

'জামাই,' বলল রাওয়াইয়া। রাজুর দিকে ফিরে, 'শহরে গেলে যখন তখন আমার জন্য একটা ট্রাক্টর আনতে পারলে না'।

'আপনার জন্য আমার জন্য সব আলাদা আলাদা ট্রাক্টর আনার কি দরকার? একটা ট্রাক্টর দিয়ে সারা রাজ্য চষে ফেলা যায়! আপনার রাজাতো আছে। দিন নেই, রাত নেই সে তো খালি ঘুরে বেড়ায়। এক বেলা ট্রাক্টর চেপে মাটি চষতে বলুন। আমি শিখিয়ে দেব'খন।' বলল রাজু।

'হ্যাঁ, এরোপ্লেন চালাতে পারি আর এই ট্রাক্টর তো কোন্ ছার। তোমাকে কিছু শেখাতে হবে না।' বলতে বলতে রাজা ট্রাক্টরের দিকে এগোতে লাগল।

'ওরে এই, দোহাই তোর, আজকেই ওটাকে নষ্ট করিসনি।' বলল তেঙ্কায়া, রাওয়াইয়ার ছেলে।

'দাদা বারণ করছেন তাই ছেড়ে দিলাম।' বলে পেছিয়ে গেল রাজা। ভাগ্যিস ট্রাক্টরে চাপতে হয়নি তাকে! ট্রাক্টরের মাথা মুণ্ডু কিছুই তো সে জানে না।

রাওয়াইয়ার বাড়িতে রাজার স্থান ছিল আলাদা। সে কোন কাজ করুক বা না করুক (কাজের কাজ সে কিছুই করত না।) তাকে কেউ

কিছু বলত না। বলার উপায় নেই। বললেই রাওয়াইয়ার স্ত্রী সুরালু নাকি কান্না শুরু করে দেয়। তার কারণ আছে। সুরালুর বোন নাগাম্মা মারা যাওয়ার সময় দশ দিনের শিশু রাঙ্গাকে সুরালুর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। রাঙ্গার বাবা তিরুপাতাইয়া সপ্তাখানেক যেতে না যেতেই আর একবার বিয়ে করল। তখন থেকে রাঙ্গা রাওয়াইয়ার বাড়িতেই ঐ বাড়ির ছেলের মত বেড়ে উঠল। রাওয়াইয়ার নিজের ছেলের চেয়ে রাঙ্গা যেন বেশি। নিজের ছেলে ভেঙ্কায়ার বয়স পঁচিশ হল। মাথায়ও বেশ লম্বা হয়েছে সে। বাপের সামনে এখনও সে চুট্টা ধরায় না। আর রাঙ্গা তার মা মারা যাওয়ার ফলে বাচ্চা বয়স থেকেই তার মার ভাগের বিষয় সম্পত্তি পেল। পাঁচ বছর বয়সেই সে কোমাটি হনুমান্তুর দোকানে ধারে বিড়ি কিনে রাওয়াইয়ার মুখের উপর খেতে শুরু করে দিয়েছিল। সতের বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে যুবতীদের উদ্দেশ্য করে নানা কথা ছুঁড়ে দিতে লাগল। রাওয়াইয়াকে এসব ব্যাপারে কেউ অভিযোগ করে না। তবু, রাওয়াইয়া জানে সবই। রাঙ্গার প্রতি রাওয়াইয়ার এক বিচিত্র টান ছিল। রাঙ্গা কোন কথা বললে রাওয়াইয়া হাঁ করে শোনে। অনেকক্ষণ ধরে.বললেও বাধা দেয় না, শোনে। রাঙ্গা যে ভাবেই থাকুক কারো চোখে সে খারাপ হতে পারে না। তার যে মা নেই এবং বাবা থাকতেও নেই তা বাচ্চা বয়স থেকেই রাঙ্গা জানে। তার কাছে সত্যিকারের বাবা মা রাওয়াইয়া আর সুরালু। ওদের জন্য রাঙ্গা জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিল।

দূরে রামী ক্ষেতের আলের ঘাস কাটছিল। রাঙ্গা সেদিকে তাকাল। রাজু ট্রাক্টরে উঠল।

'আজ এই পর্যন্তই থাক। লাঙলও তো নেবেছে ক্ষেতে।' বলল সুরাইয়া। রাজু ট্রাক্টর স্টার্ট করল না।

সুব্বাইয়া ও রাওয়াইয়ার এই ট্রাক্টর ব্যবসায় কেমন লাভ হবে না হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিছুটা আবার বলা চলে সংস্কারও আছে। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে যে লাঙলে কাজ করিয়ে

সোনার ফসল ঘরে তোলা যাচ্ছে তাই যথেষ্ট। আবার এসব ট্রাক্টর দিয়ে হবেটা কি? সেটা যদি আবার বিগড়ায়? বলদের অসুখ করলে আর একটা বলদ আছে। ট্রাক্টরের ব্যাপারতো মাথা মুণ্ডু কিছুই আমাদের জানা নেই। শেষ পর্যন্ত ট্রাক্টরকে বিশ্বাস করে আর বলদ ও লাঙলকে উপেক্ষা করলে ক্ষেত খামারের কাজ ব্যাহত হবে। প্রথমে মোহ থাকার আর একটা সূক্ষ্ম কারণ আছে। যত বড় ব্যবসায়ীই হোক না কেন লাভ থাকবেই। লাঙলের ব্যবসায় যে রাজু নাম করেছে সে ট্রাক্টরের ব্যবসায় সেই সুনাম রক্ষা নাও করতে পারে। যন্ত্র মানুষকে উপেক্ষা করে। কেউ যে আছে তা সে ভ্রুক্ষেপ করে না। তার কোন মন নেই; ভয় ভীতিও নেই। তার কোন গর্ব নেই। যত যন্ত্র নিয়েই কাজ করা হোক না কেন ট্রাক্টর মানুষের গোলাম নয়। মানুষই যন্ত্রের কাছে গোলাম হয়ে যেতে পারে। যুগ যুগ ধরে যে দাপট তারা চালিয়ে আসছে তা এই ট্রাক্টরের কাছে চলবে না। রাওয়াইয়া 'ওসব চলবে না' বলে ধমক দিলে ভেঙ্কান্না জবাব দিতে পারল না। রাজু ট্রাক্টর কিনতে চাইলে সুব্বাইয়া তত জোরের সঙ্গে বারণ করতেও পারল না।

শেষ পর্যন্ত ট্রাক্টরটাকে আনার ফলে রাজুর মনে যে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি দেখা দিল তা দেখে সুব্বাইয়ার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হল।

ট্রাক্টরের প্রতি অনিচ্ছা থাকলেও রাওয়াইয়া এমন ভাব করতে লাগল যেন কোন এক ব্যাপারে তার অভূতপূর্ব জয় হয়েছে বলে মনে হল সুব্বাইয়ার কাছে।

ট্রাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে রাজু এমন ভাবে তার দিকে তাকাতে লাগল যে লক্ষ্মী কিছুটা চমকে গেল। তার মুখ লাল হয়ে গেল। তার দামী লজ্জাটাকে সে তেঁতুল গাছের আড়ালে রাখল। তবু রাজুর চোখে পড়ল তার সলজ্জ ভাব। রাজুর নজরে পড়ে গেছে ভেবে লক্ষ্মীর মনে মনে হাসির জোয়ার আসে। আবার দেখতে পেলে আরো লজ্জা পাবে। লজ্জা পেলে তার চোখ মুখের অবস্থা আরও রক্তিম হয়ে উঠবে। তাই লক্ষ্মী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। খুশী খুশী মেজাজে তার একটা

হাত খেজুর পাতা টান দিয়ে ছিঁড়ে দিল। সেটা সে ছোরার মত ছুঁড়ল। ক্ষেতের বুক চিরে এলো মেলো পা ফেলে লাফাতে লাফাতে সে যেতে লাগল। লক্ষ্মী নিজের লজ্জা লুকানোর চেষ্টা করলেও তার সেই লজ্জার লাল আবির যেন ছড়াতে ছড়াতে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। রাজুর চোখে গোলাপী রঙের আভা। তেঁতুল গাছের গোড়া থেকে উপরের দিকে তাকাতে তাকাতে রাজু দেখতে পেল দুটো সলজ্জ চোখ। কাছেই ছিল একজোড়া লাঙলে জোড়া বলদ। ক্ষেতের এক সবুজ প্রান্তে বসল লক্ষ্মী। রাজু ঐ বলদ গুলোকে একটু নাড়া দিল। বিশাল এই পৃথিবীর একপ্রান্তে ঐ সবুজ ক্ষেতে একান্তে বসা যায়। লক্ষ্মী বসে আছে এক পুকুরের পাড়ে। মাচায় বসে পা ঝুলিয়ে রেখেছে। হাত বাড়িয়ে কাছের একটা গাছ থেকে যে ডালে কুঁড়ি ধরেনি সেই রকম ডাল টেনে নিল লক্ষ্মী। ঐ ডালের আগায় কুঁড়ি ধরবে। ফুল ফুটবে। সেই ডাল নুইয়ে জলের শ্লেটে লিখে দিল লক্ষ্মী। জলের বুকে আঁকা আকাশের ছবি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ডালের লেখা পেয়ে জলে জেগে উঠল ছোট ছোট তরঙ্গ। গোটা আকাশের কত আঁকা বাঁকা রেখার ছবি ভেসে উঠল জলের আস্তরনে। ঢেউ যেখানে জাগছে মুহূর্তে সেখানেই মিশে যাচ্ছে। গোল গোল হয়ে তরঙ্গগুলো বড় হতে হতে আকাশের কাটা কাটা অংশের ছবি আঁকতে আঁকতে হারিয়ে যাচ্ছিল। সব মিলিয়ে সে এক স্নিগ্ধ আমেজ। চুনো পুঁটি লক্ষ্মীর পা ছুঁয়ে চলে গেল। লক্ষ্মী মুহূর্তে চমকে উঠল। তারপর সে জল থেকে পা তুলে কচি ঘাসের বুকে শুলো। পা ঝোলানোর সময় তার পায়ের কাছের শাড়ীর পাড় যে ভিজে গেছে তা সে লক্ষ্য করেনি। লক্ষ্মী আবার পা ডোবাবে ভাবল। মনে মনে তার ইচ্ছা আবার আসুক মাছটা। তার পা ছুঁয়ে যাক। ঐ মাছের ছোঁয়া না পেয়েও পাওয়ার অনুভূতিতে লক্ষ্মী আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ টের পেল পুকুর ঘাটের কাছে এসে গেছে তিনটি মানুষ। লক্ষ্মী চমকে উঠে বসল। তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কাছেই আছে রাজু। তার দিকে তাকালে আর কিছু করা যায়! আর তার দিকে না তাকালে এই ধড়ফড়ানির

কোন মানে হয় না। বৃথা। রাজু সেখানে আসবে এই আশঙ্কা করে সে লুকোবে ভেবেছিল। কিন্তু লক্ষ্মী যে না লুকিয়ে এখানে বসে আছে। সে যদি তাকে আদৌ না দেখতে পেত? দিঘিটা তো ওদের নয়। পুকুরের পাটটাই রাজু আর লক্ষ্মীদের ক্ষেতের সীমা নির্দ্ধারণ করছে। নিজের জমিতেই আছে লক্ষ্মী। তবু প্রত্যেকদিন সে এসে বসে এই জমিতে। কেউ তাকে এসে দেখুক সেই প্রত্যাশায় নয়। না দেখার কথাও সে ভাবে না। তাহলে আসে কেন? প্রত্যেকদিন? রাজুর জন্য? না তার ইচ্ছা শুধু বসা। হঠাৎ রাজু তাকে দেখে কথা বললে সে লজ্জায় মরে যাবে। পাঁচ সাত বছর আগে তাল শাঁস নিয়ে সে একবার ঝগড়া করেছিল, এই যা। তারপর আর কোন দিন সে কথা বলেনি। একদিন মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে যাচ্ছিল রাজুর ওপর। রাজু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। রাজু মুখ টিপে হাসতে হাসতে এক পাশে সরে গেল। লজ্জায় সে আর পা বাড়াতে পারল না।

'মার কাছে কি চাইবে?' জিজ্ঞেস করল রাজু।

কি চাইবে তা বলতে ইচ্ছে করল লক্ষ্মীর। ওমা তা কি বলা যায়! ছুটে ভেতরে চলে গেল লক্ষ্মী।

পনাচারি (পূজারী) চোখ মিট মিট করে তাকায় তার দিকে। সেই চাউনি কোঁড়ে না। শুধু নড়ে। সব কিছু বুঝে ফেলার ভাব ফুটে ওঠে সেই চাউনিতে। পুরুতঠাকুর মুখ টিপে এমন ভাবে হাসল যেন সে সব বুঝতে পেরেছে। তারপর তার হাত থেকে ডালা নিল। তার মনের সমস্ত ইচ্ছে মা মল্লমার কাছে নিবেদন করে মার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে মনে হল লক্ষ্মীর।

পুকুরের ওপার থেকে রাজু বলল, 'এই ফসল হয়ে যাক। এর পর সমস্ত সীমানা তুলে ফেলে দু পক্ষের জমি মিশিয়ে দেব।'

'হাই বাপ, সব মিশিয়ে দিলে কোনটা রাওয়াইয়া কাপুর ক্ষেত আর কোনটা আমাদের ক্ষেত বোঝা যাবে কি করে!' গঙ্গাম্মা বলল।

'কাগজে কি লেখা নেই কার জমি কত? একসঙ্গে চষব, একসঙ্গে বীজ বুনব। যার যত জমি সে তত ফসল পাবে। অন্য দেশে এই

রকমের সীমানা থাকে না। হাজার হাজার একর জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করলে তবে ট্রাক্টর কিনে পোষাবে।'

'পোষালে তো গোটা দেশের সীমানা তুলে দেখা যায়।' বলল গঙ্গাপ্পা। চোখ ছানাবড়া করে বলল। ফসলের আঁটিগুলো নড়ে গেল। তাদের মাঝ থেকে স্ফুলিঙ্গের মত নড়ে গেল লক্ষ্মী। ভয়, দোলা, লজ্জা সব মিলিয়ে লক্ষ্মীর চোখে খেলে গেল হরিণ শাবকের চাঞ্চল্য। চমকে উঠল গঙ্গাপ্পা। আড়াল থেকে রাজু উপভোগ করল ব্যাপারটা। রাজুর চাউনি হয়ত লক্ষ্মীর চোখে পড়েছে অথবা রামীর মাথার ঝুড়ি হয়তো আড়াল করে দিল সব কিছু। কেন কেউ জানে না। তবু লক্ষ্মী ভীষণ লজ্জা পেল। রাজুর মুখ টিপে হাসা, রামীর হি হি করে হাসা সব মিলিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করল যে লক্ষ্মীর লজ্জার চাপে দম আটকে আসার উপক্রম হল। সমস্ত শরীরটা যেন কাঠ হয়ে গেল। লজ্জায় তার ইচ্ছে করলো ঐ সবুজ ঘাসের নিচে যে কালো মাটি আছে সেই মাটিতে মিশে যাওয়ার।

'হাঁ করে তাকাচ্ছ কি গো! কাঠ হয়ে পড়েছ যে! হাত বাড়িয়ে ধরে তুলবে তো।' রামী বলল কটাক্ষ করে।

'যা, অসভ্য কোথাকার! লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে একেবারে!' বলল লক্ষ্মী। পেছন দিকে তাকাতে পারল না লক্ষ্মী। কে জানে রাজু হয়ত আসছে। ঘাবড়ে গেল সে। পা মুচড়ে গেল তার। ব্যথা পেল কিন্তু সে কোন আওয়াজ করতে পারল না। টের পেল রাজু একেবারে কাছেই আছে। ঠিক পেছনে। চট করে চলে এল রাজু। অন্য দিক থেকে পায়রার মত উড়তে উড়তে এল মল্লি। দুজনে হাতাহাতি করে তাকে দাঁড় করাল। রাজুর হাতের ছোঁয়া পেয়েই লক্ষ্মীর প্রায় অবশ শরীরটা যেন কুঁকড়ে একটুকু হয়ে গেল। 'থাক ধরতে হবে না। হাঁটতে পারব। ছাড়ুন।' বলল লক্ষ্মী।

'ঠিক আছে চল।' বলল রাজু।

'তুমি ছেড়ে দাও বাওয়া, আমি ধরে নিয়ে যাচ্ছি।' বলল মল্লি।

আগে যার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা করালে, তার এখন টাকা পঞ্চাশেক চাইলে ছেলে বেগুনে চটে যাচ্ছ?'

'ওরে পাজী, হারামজাদা ছেলে, এ সব কথা বললে তোকে সোজা ত্যাজ্যপুত্র করে ফেলব, বলে দিচ্ছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি রোজগার করছি, আরামে খেয়ে পরে থাকবে তা নয়, আবার ওর হাতে নগদ টাকা দিতে হবে। টাকা!'

ধর্মরাজু কোন দিন লিঙ্গরাজুর গায়ে হাত দেয়নি। লিঙ্গরাজুও বাবাকে কোন কথা জোরে বলেনি। ধর্মরাজুর 'বাইরের কাজ' মানে যে মাঙ্গির ঘর তা লিঙ্গরাজু জানে। আবার লিঙ্গরাজু যে মাঙ্গির কাছে যেতে চায় তা ধর্মরাজুও জানে। তবে এত দিন পর্যন্ত বাপ ছেলের মাঝে মাঙ্গি প্রসঙ্গে পরিষ্কার কোন কথা ওঠেনি। ছেলে যে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছে তা যে মাঙ্গির জন্যই তাও ধর্মরাজু জানে। সে যত চায় ছেলে তাকে তত দিক তা ধর্মরাজুর ইচ্ছে নয়। মাঙ্গির উপর লিঙ্গরাজুর এত টান থাকা তার খারাপ লাগে। 'নির্বুদ্ধিতা,' বলে ধর্মরাজু। মাঙ্গি ছাড়া অন্য কারো কাছে গেলে ধর্মরাজুর অতটা আপত্তি থাকত না। ছেলের জোয়ান বয়স। কিন্তু মাঙ্গি যে ডাকাত। ফন্দি করে সে লিঙ্গরাজুকে টানে। তার স্বার্থ শুধু টাকা। তাই ধর্মরাজু তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেবে ভেবেছিল। খুব জোর চেষ্টা চালিয়েও ছিল কিন্তু ঐ হারামীর বাচ্চা লক্ষণশাস্ত্রীর জন্যে একটা ভাল সম্বন্ধ চট্ করে ফস্কে গেল। বউএর নামে জীবন বীমা বানিয়ে টাকার জন্য বউকে মেরে ফেলেছে বলে পাত্রী পক্ষের লোককে সে জানিয়েছে। ওদের কি বুদ্ধি শুদ্ধি ছিল! বউএর অসুখ যখন কোন ক্রমেই সারবার নয়, তখন ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে বীমা করালো, এই যা। এতে দোষের কি আছে? তবু, নিজের ছেলে যখন ঐ বীমা প্রসঙ্গে কুকথা শোনাল তখন ধর্মরাজুর মুহূর্তে জ্বালা ধরে গেল। দরজা বন্ধ করে শেকল এঁটে হন্ হন্ করে সে চলে গেল।

ঘানির উপর বসে মাঙ্গি ধর্মরাজুকে দেখতে পেল। কায়দা করে সে ভেতরে চলে গেল।

মাঙ্গির ছিল একটা ছোট্ট টালির ঘর। দাওয়া নেই বললেই চলে।

রাস্তার গা ঘেঁসে তার জানলা। সব সময় জানলাগুলো বন্ধই থাকে। প্রথম দরজার পরেই পড়ে খাবার ঘর। দেয়ালের মাটিতে ধরেছে শ্যাওলা। ঘরের সামনেই ঘানি। দরজা অনেকখানি চওড়া, বড় বড় ঝুড়ি যাতে ঢুকতে পারে। তিল ঝুড়িতে করে ঢুকবে। আর তেল বেরুবে। তিলের ঝুড়িগুলো ঘানির পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে হয় মাঙ্গির ঘরে। ঘরের ভেতরের দিকে অথবা পেছনে পায়খানার কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে তা আছে সেখানে বাইরে এসে যেতে হয়। ধর্মরাজু দাওয়ায় এলো। কলুর বলদ ঝিমোচ্ছিল। ধর্মরাজু দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো। তারপর মাঙ্গির ঘরের দরজার আড়ালের দিকে চোখ ফেরাল। দরজায় আর চৌকাটে তেল লেগে লেগে সেই জায়গাটা কালো চিক চিক করছিল। তিলের খোল ঘানির উপর রাখা আছে। খোলের একটা টুকরো ভেঙ্গে চিবোতে লাগল ধর্মরাজু। তারপর পা টিপে টিপে বেড়ালের মত দরজার কাছে গেল সে। আস্তে করে সে দরজা ঠেলল। কোন সাড়া শব্দ পেল না। শোওয়ার ঘরের দরজাও সে ঠেলে দেখল।

'ওমা, কে!' শাড়ী গুছোতে গুছোতে মাঙ্গি বলল।

'আমি গো।' বলল ধর্মরাজু হঠাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে।

'আ, ছাড়, ছাড়। তিন টিন তেল বের করতে হবে সকালের মধ্যে।

'তোমার ঠাকুরপো কি আছে?'

'তিল ধুতে হবে না? ঠাকুরপো পুকুরে গেছে।'

'কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাক। ঘানির বিশ্রাম হোক।' আরো জোরে জড়িয়ে ধরে ধর্মরাজু বলল।

'আ, ছাড়।' বলছিল বটে কিন্তু নিজেকে ছাড়ানোর কোন চেষ্টাই সে করেনি।

'মাঙ্গাম্মা, আছ নাকি?' ডাক শুনতে পেল ঘানির কাছ থেকে।

'গনাচারি।' বলল মাঙ্গি।

'এখন আবার কোন্ গাধার বাচ্চা ডাকছে?' বিরক্ত হয়ে জোরে জিজ্ঞেস করল ধর্মরাজু।

'দেবতুল্য লোক। তাকে গাল দিলে মুখে পোকা পড়বে।' বলতে বলতে আলতো করে নিজেকে ছাড়িয়ে চলে গেল মাঞ্জি।

'কি খবর কাকু? শুনলাম এ বছর মল্লম্মার উৎসব নাকি হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল মাঞ্জি।

'বড় লোকের বাড়ির ব্যাপারই আলাদা। এ বছর ওরা হাত দিয়েছে তো। খুব ঘটা করেই হবে। দুটোই রত্ন। লক্ষ্মী আর রাজুবাবু।' মাঞ্জি ইতিমধ্যে তেল ঢেলে দিল গণাচারির পাত্রে। গণাচারি গাঁট থেকে পয়সা বের করে দিতে চাইলে মাঞ্জি তা নিল না। 'ওমা, মায়ের প্রদীপের জন্যে তো তেল নিচ্ছেন! এ ব্যাপারে কি পয়সা নেব।'

'মার আশীর্বাদ তুমি পাবে মা।' বলল গণাচারি।

গণাচারিকে এগিয়ে দিয়ে ঘরের দিকে মুখ ফেরাতেই অন্যদিক থেকে বেড়ালের মত পা টিপে টিপে চলে এল লিঙ্গরাজু।

'বাবা না...' কি যেন বলতে গেল লিঙ্গরাজু. তৎক্ষণাৎ ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে ভেতরে বাবা আছে বলে ইশারা করল মাঞ্জি। সে নিজে গিয়ে বসল ঘানির ওপর। ঘানির বলদটার ল্যাজে সে মোচড় দিল। লিঙ্গরাজু বুঝতে পারল না, যাবে কি থাকবে। অনেকক্ষণ ধরে মাঞ্জি ভেতরে আসছে না দেখে ধর্মরাজু নিজে বেরিয়ে এল। দরজার ফাঁক দিয়ে ছেলেকে দেখতে পেয়ে আর সে রাগ চাপতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, 'ওরে এই চোট্টার বাচ্চা।'

চট্ করে মাঙ্গাম্মার পাশে ঘানির ওপর গিয়ে বসল লিঙ্গরাজু। বাপের রাগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মাঙ্গাম্মার পিঠের আড়ালে লুকালো সে।

'ওরে হারামজাদা, তোকে না, তোকে কাঁচা চিবিয়ে ফেললেও পাপ হবে না।' বলল ধর্মরাজু।

'ছি! বাচ্চা ছেলেকে অমন কথা বলতে আছে? বালাই ষাট।' বলল মাঙ্গাম্মা।

'নাব, ঘানি থেকে!' চিৎকার করে উঠল ধর্মরাজু।

'নাববো না।' জোর গলায় বলল লিঙ্গরাজু। মাঙ্গাম্মার পেছনে

থাকতে পেরে তার সাহস যেন বেড়ে গেছে। ধর্মরাজুর সমস্ত রাগ আছড়ে পড়ল বলদের ওপর। বলদ সামনের পা ছুঁড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ ঘানির ওপরে বসে থাকা লিঙ্গরাজু ধপাস করে পেছনে পড়ে গেল। ওর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজুর রাগ যেন একটু কমে গেল।

'এইরে! বাবার আমার মাথা বোধ হয় ফেটে গেছে!' সে তাড়াতাড়ি এসে তুলতে গেল। মাঙ্গাম্মা ঘানি থেকে নেবে লিঙ্গরাজুর মাথা তুলে যত্ন করে ধরল।

'হায় হায়, ছেলের আমার মাথা ফুলে গেল গো! চল, খোল গরম করে লাগিয়ে দি। ভেতরে চল।' বলতে বলতে সে ভেতরে নিয়ে গেল।

ধর্মরাজুর সব রাগ পড়ে গেল। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। যে মেজাজ নিয়ে সে মাঙ্গাম্মার কাছে এসেছিল সেই মেজাজ আর রইল না। ছেলের ওপরের রাগ গড়াতে লাগল বলদের ওপর, মাঙ্গাম্মার ওপর, শুকোতে দেওয়া খোলের ওপর। একটা খোলের টুকরো তুলে নিয়ে যত জোরে পারল সে আছড়ে ফেললো মাটিতে। তারপর বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

ছেলের চোখে মুখে কান্নার ছাপ দেখতে পারে না ধর্মরাজু। মাঙ্গি কাঁচা খোল গরম করে আঘাত লাগা জায়গায় লাগাল। চিৎকার না করলেও গোঙাতে লাগল লিঙ্গরাজু। সেই গোঙানি যেন তাড়া করতে লাগল ধর্মরাজুকে। ধর্মরাজু পা চালিয়ে যেতে লাগল, যাতে ঐ গোঙানি তার কানে না যায়। কিন্তু সে যত দূরেই যাক সেই গোঙানি সে ঠিক শুনতে পাচ্ছিল। ভূতের মত পিছু নিয়েছে সেই গোঙানি। শেষ পর্যন্ত ধর্মরাজু গেল মুনসেফ রাওয়াইয়ার বাড়ি। অন্তত ছেলের গোঙানি সে শুনতে চায় না।

সুব্বাইয়া কাপু, রাওয়াইয়া কাপু, ভেঙ্কান্না, পুন্নাইয়া বিরাট বড় দাওয়ায় বসে ছিল। অত বড় দাওয়া ঐ গ্রামে কারও নেই। বাড়ির সামনেই ধানের গোলা। নিচেটা পরিষ্কার করে ঝাঁট দেওয়া, গোবর মাটি লেপা। তারপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেলফুল সহ নানা ফুল গাছের বাহার। আর আছে কয়েকটি আম গাছ, নেবু গাছ। অন্য দিকে

কুয়ো। কুয়োর দুটো দিক দেয়াল দিয়ে ঘিরে স্নানের জায়গা করা হয়েছে। এমন ভাবে দেয়াল তোলা হয়েছে যাতে দাওয়ায় বসে কুয়োর কাছে স্নান করা লোকেদের দেখা না যায়। বড় বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে ছিল বৈঠকখানা ঘর। ঐ ঘরে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বাড়ির ছেলেরা যে আড্ডা মারে, তাস খেলে, তা রাওয়াইয়া জানে। তাস খেলা রাওয়াইয়া একটুও পছন্দ করে না। সে কথা তার ছেলে রঙ্গা জানে। খেলার সময় রাওয়াইয়া ওদিকে যায় না।

কার আসার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গা হাতের তাস ফেলে দিয়ে সমস্ত তাস মিশিয়ে দিল। দেখতে পেল ধর্মরাজু করণমকে।

'খেলাটা বেশ জমেছিল। দিলেন তো ভেঙে। কোন দিন এমন সুন্দর তাস পাইনি।' বলল রঙ্গা। অমন সুন্দর খেলা ভেঙে দিতে পেরে ধর্মরাজুর রাগ যেন আরও কিছুটা কমে গেল।

'এ রকম সময় মাঙ্গিকে ছেড়ে চলে এলেন? দেশ রসাতলে যাবে যে!' বলল রঙ্গা। ওর মুখে কোন আগল নেই।

'চুপ কর! ছেলেটা একেবারে বকে গেছে।' হাসতে হাসতে সে বলল। খোঁচা খেয়ে হঠাৎ ধর্মরাজুর মনে আবার যেন সূক্ষ্ম অনুরাগ জেগে উঠল।

রাগে পা চালিয়ে দিল ধর্মরাজু। আঙিনায় কাঁচা তেঁতুল পাতা শুকোতে দেওয়া ছিল। আর একটু হলে সে মাড়িয়েই দিত। তখনই ডাক দিল ভেঙ্কায়া, 'আরে এই! দেখে চল।' করণম্ ঝট্ করে তাকাল নিচের দিকে।

'ভারি তো কচি তেঁতুল পাতা তার আবার সাবধান হতে হবে। অতই যদি ইয়ে হয় তো যাতায়াতের পথে শুকোতে দেওয়া কেন বাপু? অন্ধকার হয়ে গেছে। অত সাবধানে নিচের দিকে তাকাতে তাকাতে কেউ চলা ফেরা করতে পারে?' বলে দুটো পাতা তুলে মুখে দিল। দাঁত দিয়ে আস্তে আস্তে পাতা চেপে, কেটে, চেখে বলল, 'চমৎকার পাতা খাওয়া। কচি তেঁতুল পাতা ঠিক এই রকম পাতাকেই বোঝায়।'

'ওরে ভেঙ্কায়া, করণমের নজর পড়েছে। এক চুবড়ি পাতা পাঠিয়ে

দিস ওদের বাড়ি। না দিলে আমাদের হজম হবে না।' বলল রাওয়াইয়া। ধর্মরাজু হাসল। সেই হাসি গলায় জেগে উঠে ঠোঁটের কোনে হারিয়ে গেল। কোন দিনই তার হাসি খুব বেশি ভেতর থেকে আসে না।

'বড় কাপু দুজন বসে আছে। বিয়ের কথাটা পাড় না।' আস্তে আস্তে বলল ধর্মরাজু।

'করে ফেলতে হবে। সামনে, মায়ের পূজো হয়ে গেলেই লগ্ন দেখে সেরে ফেলতে হবে।' বলল সুব্বাইয়া।

'দেখ বাওয়া,' বলে খুব একটা গোপনীয় কিছু বলার মত করে রাওয়াইয়া কাপুর কাছে গিয়ে ধর্মরাজু বলল, 'পণের কথাবার্তা আগে ভাগে সেরে নেওয়া ভাল। পরে আবার সব ঝামেলা একসঙ্গে সারা যাবে না। ফলে তোমার মেয়ে শ্বশুর বাড়ি করতে এসেও শান্তি পাবে না।' বলার ঢংটা এমন যেন খুব গোপনে বলছে অথচ কণ্ঠস্বর বেশ চড়া।—সবাই যাতে শুনতে পায়।

'আঃ চুপ কর দিকি।' বিরক্ত হয়ে রাওয়াইয়া বলল।

'ব্যাটা পাকা খচ্চর। শকুন।' বলল ভেঙ্কান্না।

'খারাপ কথা না বললে তার চোখে ঘুম আসবে না।' বলল সুব্বাইয়া।

এতগুলো লোকের মনে বিরক্তি ধরানোর মত কথা বলতে পেরেছে ভেবে করণম মনে মনে খুব খুশী হল। তার রাগ আরও কিছুটা কমল।

'বড় কাপু কিছু মনে না করলে আমি একটা কথা বলতাম। যুগ যুগ ধরে দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় থাকুক এটাই আমার ইচ্ছে। ছোট খাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে বলে আমার আশঙ্কা। তাই ঐ কথা বললাম। সুব্বাইয়াদা, তোমার মনের কথা খুলে বল বাওয়াকে রাজী করানোর দায়িত্ব আমার। ওঁর তো মাত্র একটা মেয়ে।'

'ওসব ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও তো। ভাল মন্দ আমি বুঝব। তোমাকে আর নাক গলাতে হবে না।' বলল সুব্বাইয়া।

সুব্বাইয়া নিজেই এই বিষয়টা ভাল করে বুঝতে চায়। আবার নিজে যে আগে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করবে তাও সে পারছিল না। তাই এই প্রস্তাব আসাতে এক দিক দিয়ে সে মনে মনে খুশীই হয়েছিল।

সুব্বাইয়ার বাড়ি ফিরতেই পুন্নাইয়াকে সুন্দরাম্মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পণের বিষয়ে পাকা কথা হল?'

'বাবা জিজ্ঞেস করে নি। মামাও কিছু বলেনি। নিজেদের মধ্যে পণের কথা আবার কিসের?' বলল পুন্নাইয়া।

'আমার বাপের বাড়ির কাছ থেকে পঁচিশ একর জমি নেবার সময় তো খুব তৎপর ছিল তোমার বাবা।' খোঁচা দিয়ে বলল সুন্দরাম্মা।

ক্ষেত থেকে ফিরেই রাজু এই কথাগুলো শুনল।

'পণের কথা তুললে কিন্তু আমি বিয়ে করব না।' ক্ষোভও দৃঢ়তার সঙ্গে সে বলল।

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? পণ ছাড়া বিয়ে হয় না কি?' বলল সুব্বাইয়া।

'কেন? পণ না নিলে কি ভিক্ষে করে খেতে হবে? যাদের টাকা রোজগারের কোন মুরোদ নেই তারাই পণের জন্য হ্যাংলামো করে।' বলল রাজু।

'কি যে সব দেমাগের কথা!' বলল শেবাম্মা।

'মুরোদ আছে বলেই পণ নেব। পণ না নিয়ে বিয়ে করলে আমাদের গৌরব থাকে কোথায়?' খুব রেগে গিয়ে সুব্বাইয়া বলল।

'ছেলেকে পণের নাম করে কিছু টাকা নিয়ে হাটে বিক্রি করা খুব গৌরবের না? সরকারের নতুন আইনের কথা জান? পণ যে নেবে আর যে দেবে দু পক্ষকেই শাস্তি পেতে হবে।' বলল রাজু।

'আইন করেছে তো বয়েই গেছে। ওসব কত হয়! অনেক দেখেছি। এবার আসবে না ভোটের জন্যে? ঐ সেন্সল রেড্ডি, সুব্বারাজু, তখন তাদের জিজ্ঞেস করব। বাপ চোদ্দ পুরুষ ধরে যে আচার বিচার চলে আসছে তা তুলে দেওয়ার আইন কে করতে বলেছে? বলি, ওসব

সরকারি নির্দেশ তোয়াক্কা করে না কি কেউ? কেউ করেছে?' জোর গলায় বলল সুব্বাইয়া।

রাজু হেসে বলল, 'লোকসভা অন্তত এই একটা ভাল কাজ করেছে বলে কোথায় খুশী হবে তা না উল্টে অন্য কথা বলছ।'

'আজকালকার ছেলেদের আদব কায়দাই আলাদা। এ বাড়ির ছেলে কোনদিন বাপের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখের ওপর কথা বলেনি।' কাশতে কাশতে বিরক্তির স্বরে বলল সুব্বাইয়া।

'যুগ বদলাচ্ছে, বাবা।' বলল রাজু।

'হ্যাঁ তাতো বটেই। ক্ষেতে যেদিন থেকে ট্রাক্টর নেবেছে সেদিন থেকেই যুগ বদলে গেছে।'

সুব্বাইয়া দাওয়ায় চলে গেল। এই তর্কের যে শেষ নেই তা সে জানে। এক পক্ষকে চুপ করতেই হবে। রাজু চুপ করবে না। রাজুর সঙ্গে যত তর্ক করা যাবে ততই তা বাড়বে। এটা সুব্বাইয়া ভাল ভাবেই জানে। তাই সুব্বাইয়াকেই থামতে হবে। তা ছাড়া রাজু গূঢ় কোন উদ্দেশে এই কথাগুলো বলছে বলেও তার ধারণা হল। ছেলের মধ্যে সততার প্রতি একটা আকর্ষণ আছে দেখে সুব্বাইয়া এক দিক থেকে খুশী। অন্য দিক থেকে আবার সে গর্বও বোধ করে। ট্রাক্টর আনার ব্যাপারেও অনেক তর্ক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেদিন রাজুর কথাই টিকল।

গরুর জাব মাখাতে মাখাতে মল্লি এ সব কথা কান খাড়া করে শুনল। নিজের অজান্তেই তার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটল। গলায় গানের কলি চলা ফেরা করতে লাগল। রাজু বাওয়া সব সময়ে ঠিক কথাই বলে। রাজু বাওয়ার মত লোক আর হয় না।

'মল্লি, আর কতক্ষণ জাব মাখবি? গরু আর বলদ জোড়া যে জাব দেখে ডাকছে, লাফাচ্ছে! শুনতে পাচ্ছিস না।' আঙিনা থেকে খিড়কির দিকে যেতে যেতে বলল রাজু।

মল্লির ঠোঁট থেকে তখনও চাপা হাসি মুছে যায় নি। সে জাব নিয়ে গোশালে গেল। রাজু চান করতে কুয়োর কাছে গেল।

বড় গামলা বলদ জোড়ার সামনে সে রাখল। হাঁক পাঁক করে বলদ ছুটো গামলায় মুখ দিয়ে খেতে লাগল। দ্বিতীয় গামলা খুঁটিতে বাঁধা গাভিন গরুর কাছে সে রাখল। বাওয়ার বিয়ের আগে গরুটার বাচ্চা দেওয়ার কথা। বাওয়া ছানা খুব ভাল বাসে। পেটের বাছুরটার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাছুরটাকে রাজু বাওয়া মানুষের ভাষা শেখাবে। পাশে যে বলদ জোড়া জাব খাচ্ছে, ওগুলোও এই গরুটার বাচ্চা। ঐ বলদ জোড়াকে বাওয়া অনেক কিছু শিখিয়েছে। যেখানে বলবে বলদ জোড়া সেখানে চলে যাবে। আবার ডাকলে সোজা চলে আসবে। যেতে বললেই চলে যাবে। কাউকে গুঁতোতে বললে গুঁতোবে।

জাব আর একবার নেড়ে মল্লি কুয়োর কাছে গেল হাত ধুতে। পিঁড়ির ওপর বসে ছিল রাজু। গঙ্গাম্মা কুয়ো থেকে জল তুলে তার পিঠে ঢালছিল। রাজু প্রত্যেক দিন ক্ষেত থেকে ফিরে স্নান করে।

'দাদা, হাতে একটু জল ঢালতো।' বলল মল্লি।

জল ঢালতে ঢালতে গঙ্গাম্মা বলল, 'ওরে বাওয়া, এর জন্যও একটা ভাল পাত্র দেখতো। তোমার বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে এর বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে।'

'ভাল কথা বলেছ। একে কে বিয়ে করবে বল দিকি? ধোপাদের বুড়োদা কি রাজী হবে একে বিয়ে করতে?' হাসতে হাসতে গা রগড়াতে রগড়াতে বলল রাজু।

'কেন, মাইমা-ই বা কদ্দুর লেখাপড়া করেছে?' বলল গঙ্গাম্মা।

'সেদিন আলাদা ছিল। দুটো ছেলেমেয়ের মা হওয়া পর্যন্ত মা নাকি বাবার সঙ্গে তেমন কথাই বলতে পারেনি। আর আজকাল বিয়ের আগে থেকে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে চিঠি লেখা লেখি হয়।' বলল রাজু।

'তাহলে ঠাকুরপো অনেক চিঠি পাচ্ছে আমার বোনের কাছ থেকে।' বাটি ধুতে এসে সুন্দরাম্মা বলল।

কথাটা বলেই আস্তে আস্তে সে চলে গেল। গঙ্গাম্মা তার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজুর গায়ে জল ঢালতে ভুলে গেল।

মল্লিও ধীরে ধীরে পা ফেলে অন্য মনস্ক ভাবে নিজের ঘরে চলে গেল। ভাঁড়ার ঘর আর খাবার ঘরের মাঝের একটা ছোট্ট ঘর হল তার। ঐ ঘরের দক্ষিণ দিক দিয়ে খিড়কির দিকে যাওয়ার পথ আছে। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুলেই এক ফালি জমি। সেখানে পায়খানা ইত্যাদি আছে। জমিটা একটু উঁচু। ঐ জমি ঘেরা আছে একটি উঁচু দেয়াল দিয়ে। পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে বেড়ে উঠেছে একটা তেঁতুল গাছ। গোয়ালের দক্ষিণ দিকে গজিয়ে উঠেছে নাইট কুইনের একটা কুঞ্জবন। চাঁপা ও বেলিফুলের গাছও আছে কয়েকটা। বাড়ির দক্ষিণ দিকে চারটি ঘর আছে। প্রথম ঘরটি রাজুর। দ্বিতীয়টি পুন্নাইয়ার। তৃতীয়টি ভাঁড়ার ঘর। আর চতুর্থটি মল্লির। মল্লির ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজাটা সব সময় খোলাই থাকে। ঐ দরজার দোরে বসে চাঁপা ফুলের গাছের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। হপ্তায় এক দিন ঐ ফুল গাছে ভরা জমিটা ভাল করে গোবর মাটি দিয়ে সে লেপে দেয়।

শীতকাল শেষ হলেই পুন্নাইয়া, সুন্দরাম্মা খাটিয়া পাতে ঐ দক্ষিণের উঁচু জমিতে। রাজুও নিজের ঘরে ঘুমোতে পারে না। কারণ তার ঘরের দক্ষিণের জানালা বা দরজা খোলার উপায় নেই। তাই সে বাড়ির বাইরের আঙিনায় খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। মল্লি কিন্তু দরজা খোলা রেখে ঘরেই শোয়। শশুর বাড়িতে এসে শোওয়ার এই ব্যবস্থা দেখে প্রথম প্রথম সুন্দরাম্মা খুব সঙ্কোচ বোধ করে ছিল। নিজের বাইরে শোওয়া যেমন তার অপছন্দ তেমনি সে পছন্দ করত না মল্লির দরজা খোলা রেখে শোওয়া। বিশেষ করে মল্লির বয়স যেহেতু ষোল বছর হয়ে গেছে!

পুন্নাইয়া তাকে বোঝাল যে মল্লি মনের দিক থেকে একেবারে শিশু। সুন্দরাম্মাও অবশ্য ক্রমশ তা বুঝতে পারল। মল্লি সত্যি একটি সাধারণ সহজ সরল মেয়ে।

তাই বলে মল্লির সহজ সরল ভাব কিন্তু সত্যি সত্যি শিশুর সহজ সরল ভাব নয়। তারও মনের বয়স হয়েছে। সেই মনের কানায় কানায় ভরে রয়েছে রাজু।

মল্লি বাড়ির কাজ করে। কাজ করার সময় তার হাতগুলো যান্ত্রিক ভাবে কাজ করে যায়। তার অভ্যেস কাজ করা। তাই সে করে। তার মন পড়ে থাকে রাজু বাওয়ার ওপর। রাজু বাওয়ার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে হতে যাচ্ছে বলে তার মনের কোনে একটুও ঈর্ষা বা ব্যথা নেই। বাপ ছেলের মধ্যে পণ নিয়ে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন সে মনে মনে আনন্দে হাসছিল। কারণ, সে জানে ঐ বিয়ে হবেই। এটা তার দৃঢ় বিশ্বাস। সেও চায় ঐ বিয়ে অবশ্যই হোক। ঐ বিয়ের ব্যাপারে তার মনের উদ্বেগ কম নয়। সেই আনন্দ সাগরের কোন গভীরে, তার অজান্তে, কোন দিন যা পূরণ হবার নয় এমন ধরনের একটি ইচ্ছার লতা তার মনকে মোলায়েম করে ঘিরে রাখে। সেই লতা যখন নড়ে তখন তার মুখের সহজ সরল চাপা হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ফুটে ওঠে অন্যমনস্কতার ছাপ। আর তার চোখের পাতাগুলো কেমন ভেজা ভেজা লাগে। ঠিক যেন শিশুর চোখ। সেই চাউনি যারা সাধারণ ভাবে দেখে তারা ভাবে মল্লির মন শিশুর মন।

মল্লি ভেজা কাপড়টা বদলে নিল। নাইট কুইন গাছের কাছে এসে সদ্য ফুটে ওঠা এক গোছা ফুল নিয়ে নাকের কাছে ধরে বুক ভরে টেনে শুঁকল। পশ্চিম দিকের দেয়ালে উঠে সে হাতের নাগালে যে দুটো কচি তেঁতুল পেল, সেগুলো পেড়ে একটাতে কামড় দিল। মুহূর্তে দাঁত টকে গেল। মল্লির নাক চোখ মুখ কুঁচকে গেল।

গোলা থেকে ধান বের করে মেপে বস্তায় পুরছে গঙ্গাম্মা। পাদ্দালু বস্তার মুখ ধরে রয়েছে। ধান যেন পাদ্দালুর প্রাণ। একটি ধানও নিচে পড়ে গেলে সেটি সে কুড়িয়ে রাখছে বস্তায়। রামী বড় হাঁড়িতে করে ধান সেদ্ধ করে শুকোতে দিচ্ছে। পাদ্দালুর চার বছরের ছেলে বুড়তার হাতে ছড়ি। ওর ছড়ি নাড়ার ফলে একটি কাক পক্ষীও ধানে বসতে সাহস পাচ্ছেনা! পুন্নাইয়া উঁচু দাওয়ায় বসে মেজাজে চুট্টা টানছে। বেশ আরাম করে সে ধোঁয়া ছাড়ছে। সুব্বাইয়া দাওয়ায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সে থামের গোড়ায় যে ইট ছিল তার নিচে সেটা গুঁজে দিল। সুব্বাইয়ার নজরে পড়ল ব্যাপারটা। চান সেরে এসে রাজু

হাসতে হাসতে বলল, 'এই দাদা, দশ পয়সার চুট্টাটাকে নষ্ট করছিস কেন ? তুই যে চুট্টা খাস তা কি বাবা জানে না ?'

সুব্বাইয়া না শোনার ভান করে সরে গেল সেখান থেকে। বড় ছেলে যাই হোক সেকেলে রীতিনীতি কিছুটা মানে দেখে সুব্বাইয়া মনে মনে খুশী হল। অবশ্য ছোট ছেলেটার সৎ সাহসও প্রশংসনীয়। তার কাছে কোন কিছুর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কারবার ছিল না। সে যুগ বুঝে কথা বলে। নতুন যুগের নতুন মানুষের মত তার কথা। আগামী দিনে রাজুর কথা মতই কাজ হবে বলে সুব্বাইয়ার বিশ্বাস। সেই জন্যই রাজু নতুন কোন কিছু করার কথা বললে প্রথমে তার প্রাচীনপন্থী মন বাধা দিলেও শেষে সুব্বাইয়া 'তোর যা ইচ্ছে কর' বলে।

রাজু কিন্তু চুট্টা টানতে টানতে বাপের সামনে পড়ে গেলে লুকোয় না বা ফেলে দেয় না।

মল্লি পায়রার মত দেয়ালের উপর থেকে লাফ দিল। গঙ্গাপ্পা অবাক হয়ে গেল। তার মুখে কথা সরল না। ভয় যেন তার গলা টিপে ধরল। মল্লির ঐ উৎসাহের সঙ্গে লাফানোর পেছনে হয়ত কোন কারণ ছিল না। ওটা তার প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য। গঙ্গাপ্পার ভয়ও প্রকৃতি-গত। কারণ সে জানে মল্লি পড়ে হাত পা ভাঙবে না। তার কোন বিপদ ঘটবে না। তবু মল্লির দেয়ালের উপর ছুটে বেড়ানোর সময় অথবা দেয়াল থেকে নিচে লাফানো দেখে গঙ্গাপ্পার গলা শুকিয়ে যায়। তার মুখে কথা সরে না। চোখ ছানাবড়া করে সে হাঁ করে দেখে সেই দৃশ্য। মল্লি তার হাঁ করা মুখে একটা তেঁতুল পুরে দিল। গঙ্গাপ্পা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সেই কাঁচা তেঁতুল কামড়ে চিবিয়ে খেতে লাগল।

'দাঁতগুলো টকে গেলে ভাত খাবি কি করে বোন ?' জিজ্ঞেস করল গঙ্গাপ্পা। ভাবটা যেন ঐ সমস্যা তার নিজের নেই। তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই 'ঐ যে, ওটা এনে দাও তো।' সে বলল।

'কোন্‌টা ?' জিজ্ঞেস করল গঙ্গাপ্পা। পরক্ষণেই তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে বলল মল্লি, 'বাওয়া, লেখা পড়া করতে বলেছে না ?' বলে সে পাখির মত উড়ে পালাল।

'আরো ছু বস্তা মেপে দাও হে, দম্পুদের আসার সময় হয়ে গেছে।' বলল সুব্বাইয়া। অণ্য মনস্ক ভাবে কখন যে গঙ্গাম্মা ধান মাপা বন্ধ করে দিয়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি।

গঙ্গাম্মাও, মল্লি সুব্বাইয়া কাপুর দূরাত্মীয়। সুব্বাইয়ার বাবা তাদের কি ভাবে যেন দাদা হন। মল্লির বয়স যখন মাত্র পাঁচ মাস তখন তার মা মারা যায়। ছুটো শিশুকে সুব্বাইয়া কাপুর বাড়িতে ফেলে রেখে কোথায় যেন চলে গেল তাদের বাবা। কেউ জানেনা কোথায় গেল। সেদিন থেকে শেষাম্মা ঐ ছুজনকে কোলে পিঠে করে বড় করল। মল্লি পাদ্দালুরও মেয়ের মত। পাদ্দালুর বউ তাকে বুকের ছুধ খাইয়ে ছিল। রামী আর মল্লির মধ্যে বয়সের পার্থক্য শুধু এক মাস।

'আচ্ছা, মা দেখছ, আমাদের মল্লি ঐ মেথরানীটাকে নিয়ে কেমন মজা করছে। খেলছে। কেউ দেখলে কি ভাববে।' শেষাম্মাকে এক সময় সুন্দরাম্মা বলত।

'তার মার কোলে শুয়েই ছুধ খেয়েছে। তবু তুমি একেবারে সেই ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজাদের আমলের লোকের মত কথা বলছ। আজকাল কার দিনে আবার মেথর বা কি আর কাপুই বা কি।' বলত রাজু।

রাজুর নতুন চিন্তাধারা সেই বাড়ির কেউ পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। প্রাচীন আচার বিচারে কোন ঘোর প্যাঁচ নেই। নতুন চিন্তা ধারার মধ্যে কতখানি প্যাঁচ আছে, কে জানে। কোন বিপদের বীজ আছে কি না তা কেউ জানে না। তবু দিন বদলাচ্ছে বলে, চিন্তাধারা নতুন খাতে বইছে বলে, আগামী দিনের প্রতিনিধি রাজু বলে, একটা অস্পষ্ট স্বীকৃতির আবহাওয়া ঐ বাড়িতে ও ঐ গ্রামে বর্তমান। তবে গ্রামের সবাই রাজুকে ভালবাসে, রাজুর উজ্জ্বল অস্তিত্বকে সানন্দে স্বীকার করে। তাই বলে রাজুর চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রামের সবাই যে একমত তা কিন্তু নয়। কোন রকম দ্বিধা না করে, উদার মনে, পরিপূর্ণ রূপে, রাজুর বক্তব্য সহ তাকে মনে মনে গ্রহণ করেছে মল্লি। রাজুর মতামত গ্রহণ করার পেছনে তার কোন যুক্তির সুদৃঢ় বোনাদ ছিল না। তার মতে রাজু বাওয়ার কথাই ঠিক। বেঠিক কথা রাজু বাওয়া বলতে পারে

না। রাজু বাওয়া ভাল ছাড়া খারাপ করতে পারে না। তাই পড়াশোনা করা উচিত বলে, কথায় কথায় বললেও, রাজুর এই কথা বেদবাক্যের মত গ্রহণ করল মল্লি।

তার গুরু গণাচারি। গণাচারি ও তার মধ্যে এক স্নেহবন্ধন বর্তমান। গণাচারির মতে মল্লির মন সুকোমল। মল্লির মনের কোনো কোনেই একটুও অন্ধকার নেই। তার মন আলোয় আলোয় ভরা। তার চোখে মল্লি যেন মায়েরই একটা রূপ। গণাচারির কাছে শক্তিরূপিনী মা নিজের মেয়ের মত—মায়ের মত। মল্লিও তার কাছে তাই। মায়ের আর এক নাম মল্লম্মা।

তাই বলে মল্লির মধ্যেও সাধারণ জিজ্ঞাসা যে নেই তা নয়। তার পড়ার ব্যাপারটা বাড়ির সবার কাছে, বিশেষ করে সুন্দরাম্মার কাছে যে একটা তামাসা মাত্র তা সে বোঝে। তাই সে প্রতি সন্ধ্যায় গণাচারির কাছে লেখাপড়া শিখে বই পত্র মায়ের বিগ্রহের পেছনে লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফেরে। কোন সময় এ সব জানতে পেরে সুন্দরাম্মা তাকে ঠাট্টা করলেও মল্লি না শোনার ভান করে। কোন জবাব না দিয়েই চুপচাপ শুনে সে নীরব থাকে। জানাজানি যাতে না হয় তার জন্য আগেভাগে বই লুকিয়ে ফেলাই ভাল মনে করে সে।

একটা ব্যাপার সে সবার কাছে লুকিয়ে রেখেছে। গণাচারিও জানে না। দশ দিনের মধ্যে তার অক্ষর জ্ঞান হয়ে যায়। ছোট ছোট কাগজে দু তিন লাইন করে সে চিঠি লিখত। প্রথম চিঠি রাজুকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

'বাওয়া কাল রাত্রের ভাজা চিংড়ি কেমন ছিল? আমি রেঁধেছি।'

চিঠির নিচে যে নাম সই করতে হয় তা সে জানে না। এই চিঠি রাজুর হাতে পৌঁছাবে বলে সে আশা করে না। এই চিঠি রাজু বাওয়ার হাতে পড়লে সে লজ্জায় মরে যেত। আর কোন ব্যাপারে তার লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই। এই চিঠি হল তার গুপ্তধন। এই গুপ্তধন যেন কারো হাতে না পড়ে। এরকম একটা গুপ্তধন যে তার আছে তাও যেন কেউ জানতে না পারে। চিঠিতে অন্য কোন খবর থাকে না।

তবু এই ধরণের কথাই তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওর যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তার ভিত্তিতেই সে এভাবে চিন্তা করে। লেখে। সেই জন্যই সে ঐ চিঠিগুলো প্রাণের দায়ে লুকিয়ে রাখে।

'যাদি গেঙ্গার দেওয়া কুরকুরে জুতো পর না কেন?'

'বাঁদরের বাচ্চা আমের আচার ফেলে দিয়েছে। কাঁঠালের বিচি কত ভাল লাগবে ভেবে ছিলাম।'

'পরশু লক্ষ্মীদি কাঞ্চি রেশমী শাড়ী পরে এসেছে মন্দিরে। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। ঠিক যেন মা লক্ষ্মী।'

'তোমার নতুন ঘরের দক্ষিণ দিকে রোজা ফুল গাছের বীজ পুঁতেছি। তোমার ঘর তৈরীর কাজ শেষ হলেই ফুল ফুটবে।'

এই ধরনের অজস্র চিঠি। গণাচারির কাছে লেখাপড়া করার পর মল্লি আমবাগানের ভেতর দিয়ে আসে। ঐ আমবাগানের মাঝে একটা ছোট ঘর তৈরী করছে রাজু। নতুন ধরনের, বাংলো ধাঁচের ঘর। এই বিষয়ে বাড়ির সকলের সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে। বিয়ের পর রাজু আলাদা হয়ে থাক তা কেউ চায় না। যাই ঘটুক না কেন রাজু বিয়ের পর বড় বাড়িতে থাকবে না জানিয়ে দিয়েছে। রাজু জানাল যে তার এক সঙ্গে না থাকার অর্থ এই নয় যে সে পরিবারের সবাইকে ভাল বাসেনা। সুবিধার জন্য আলাদা থাকবে। কতকগুলো ব্যাপারে একত্রে থাকা উচিত আবার কোন সময় আলাদা থাকা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। দাদার বিয়ের পর এই কথাটাই সে বলে ছিল। কিন্তু দাদা তার পরামর্শে কান দেয়নি।

'বাড়িতে পা রাখতে না রাখতেই পরিবারে ভাঙ্গন ধরানোর বদনাম চাপাতে চাও আমার ওপর?' বলল সুন্দরাম্মা।

যে কোন কথাই বলা যাক না কেন রাজু যে তাতে রাজী হবে না তা সুব্বাইয়া ভাল ভাবেই জানে। তাই সে রাজুর আলাদা হওয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল বিনা বাক্য ব্যায়ে। তবু রাওয়াইয়া কাপুর কাছে এসব কিছু কেমন যেন অশ্লীল ঠেকল। অসভ্যতার ছাপ যেন প্রকট।

'যাই বল ভায়ে তোমার এই সব ব্যাপার আমার চোখে ভাল ঠেকছে

না। তুমি হয়ত অনেক যুক্তি দেখাবে, তবু বলব, দশজনে মিলে মিশে থাকলেই ভাল দেখায়। আর একত্রে আছে শুনেও আনন্দ।' বোনাদ কাটার সময় এসে আরও বলল, 'অত বড় বাড়িতে তোমার থাকার জায়গার অভাব পড়ে গেছে যে আলাদা একটা ঘর করে, একেবারে আলাদা থাকতে হবে!'

'মনের মিলটাই আসল। এক সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলেই কি মিল হয়ে যায়? ভেঙ্কাম্ন বাওয়া আর মাইমার মধ্যে মুহূর্তের জন্যও মিল হয় না তোমাদের বাড়িতে। সেই অবস্থায় আলাদা, থাকা কি ভাল নয়? রাজু পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'দেখ, তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার বাবার মত ঐ সব আজে বাজে যুক্তি মেনে নেব? আমার বাড়ির ভেঙ্কাম্মাকে আমার মুখের উপর কথা বলতে বল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে আমি দূর করে দেব?'

'মামা, এসব রাগ করার কথা নয়। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখুন। জ্বলন্ত আগুনে একটা ঘড়া উল্টে রেখে দিলেই কি আগুন নিভে যায়? ঘড়া তুলে দিলে আবার আগুনের শিখা উপরের দিকে উঠতে থাকে। তুমি যখন বাড়িতে থাক না তখন তোমার বউমা আর মাইমার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় না? ভেঙ্কাম্মা বাওয়া কি বউ এর পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলে না? এ সব যে হয় তা কি তোমার অজানা? আমার বক্তব্য হল দিন বদলেছে। অহেতুক সেকেলে কথা পেড়ে তর্ক করে কি লাভ? একান্নবর্তী পরিবার একালে অচল, মামা!'

'তোমরা আমাদের তেলুগুদের ঐতিহ্যের আর কিছু রাখবে না দেখছি।' বলে চলে গেল রাওয়াইয়া। বাড়িতে তার বউমার সঙ্গে বউ এর এক মুহূর্তও যে বনে না, তার বকুনি খাওয়ার ভয়ে, সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ, যে সবাই চুপ করে থাকে, আর তার বাড়ির বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতরে যে ছোট খাট ঝড় সৃষ্টি যে হয় রাওয়াইয়া ভালভাবেই তা জানে। তবু রাজুর নতুন সিদ্ধান্ত সে এক দিনের জন্যও মানতে রাজী নয়। তার মতে প্রাচীন কালের রীতি-নীতিই সঠিক। আর এখনকার সবই বাজে। ঐ সব রীতি-নীতি লোপ পেলে পৃথিবী

রসাতলে যাবে। তবু, তার ধারণা, রাজুর মনটা ভাল। বড়দের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে। রাজুর জিদ থাকায় রাওয়াইয়ার মনে সূক্ষ্ম গর্ববোধ আছে। তার নিজের ছেলের মত, পেটে একটা কথা চেপে রেখে, মুখে অন্য কথা রাজু বলে না।

মল্লি সন্ধ্যের মুখে প্রত্যেকদিন রাজুর বাগানের নতুন বাড়ির কাছে একবার আসে। ইটের ঢিবির ওপর বসে সেদিনের খবর সে একটা ছোট্ট কাগজে লিখে দেয়। লিখে একটি খাম বের করে। ঐ খামে আগের চিঠির পাশে এটা রেখে খামটা যত্ন করে রেখে দেয়। চিঠির তাড়া সে সব সময় আগলে রাখে। তার চিঠি গুলো অন্ধকারেই লেখা। তার চিঠির লেখায় দিনের আলো পড়লে, তার মনে হয়, যেন সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। রাত্রেও সে চিঠিগুলো আলোতে ধরে না। তবে সমস্ত চিঠি তার মুখস্থ থাকে।

সেদিন নতুন বাড়িতে দরজা জানালা বসানো হল।

'এত বড় বড় জানালা বসাচ্ছিস, বাবা, ঘরের ভেতরের সবইতো দেখা যাবে।' রাজুকে শেষাম্মা বলল।

'আলো বাতাস ঘরে ঢুকবে।' বলল রাজু।

নতুন বাড়িগুলোর ধরণ ধারণ যে কি তা ঐ বুড়োবুড়ির কাছে পরিষ্কার হল না।

'এখানে টিউবওয়েল বসাবো। পঁচিশ হাত নিচে ভাল জল পাব বলেছে ইঞ্জিনীয়ার। এদিকে তরিতরকারির চাষ করব আর ওদিকে ফুল গাছ লাগানো হবে।' রাজু বলে যাচ্ছিল। বুড়ো মা-বাবার কাছে ছেলের কথা শুনে মনে হল যেন তারা এক নতুন জগতের, নতুন বাড়ির কথা শুনছে।

গঙ্গাম্মা রাজুকে বলল, 'বাওয়া, মল্লির জন্যও একটা ভাল পাত্র দেখ তো। ওকে বিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

'পাঠাবে কোথায়? আমি বিয়ে টিয়ে চাই না।' বলল মল্লি।

গঙ্গাম্মা কথাটাকে কথার কথা হিসেবে বলে নি। না বললেও তার

কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় নি। মল্লির মনে ঐ কথা বার বার জাগতে থাকে। সারা দুপুর ক্ষেতে খামারে আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে সে ঐ বিয়ের কথা ভাবতে লাগল।

নতুন বাড়িতে আসার পথেই সে লক্ষ্য করে মিস্ত্রীরা সব যন্ত্রপাতি বেঁধে ফিরে যাচ্ছে। বাড়ির উত্তর দিকের বাগানে, নিম গাছের পাশে, একটা পাথরের উপর সে বসল। মেয়েদের বিয়ে হয়। তাকেও বিয়ে করতে হবে। মেয়ে হয়ে জন্মালে যে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয় তা যে সে জানে না তা নয়। কিন্তু মামা মাইমা, পুল্লি, রামী, দাদা এবং বাওয়া আর ঐ বাড়ির বাগানকে ছেড়ে কোথায় যাবে সে? কোথায় সে যেতে পারে? সে চলে গেলে দুধালো গাই আর বলদের জাব দেবে কে? গাছের গোড়ায় জল ঢালবে কে? এসব কাজ করার জন্য তার থাকা দরকার। এসব তারও দরকার। এই অবস্থায় তার দৃঢ় ধারণা হল যে তার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। কোন এক অজানা কারণে তার শরীরটা কেমন যেন ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছিল। যত অন্ধকার নামে ততই তার মন যেন দমে যেতে থাকে। হাতের কাছের গাছ থেকে নিমপাতা ছিঁড়ে মুখে ফেলে সে চিবোতে লাগল। সেটা যে তেতো তাও সে টের পেল না।

চট করে বুকের ভেতর থেকে খাম বের করল। সেদিন কাগজ আনতে ভুলে গিয়েছিল। পুরাণো একটা চিঠি পড়ল। বাছুর হওয়ার পর গরু যে দুধ দেয় সেই দুধের ছানা তোমার খুব পছন্দ না? কবে যেন সে লিখে রেখে ছিল। অন্য পিঠে আজকের চিঠিটা লিখতে হবে। পেন্সিলও জামার ভেতর থেকে সে বের করল। কিন্তু ভেবে পেল না কি লিখবে। তার মনের ঝুলিতে আর কথা নেই। একটা কি যেন লিখতে গিয়েও সে থেমে গেল। প্রথম অক্ষরটাই মনে পড়ছে না। অনেকক্ষণ সে ঠায় বসে ছিল। শেষে নিজের অজান্তেই লিখে ফেলল, 'আমি আদৌ বিয়ে করবো না।' লেখার পর পড়ে তার হাসি পেল। কেন সে জানে না তা, মনটা খুব হাল্কা লাগল তার। একটা বিরাট বোঝা যেন তার ঘাড় থেকে নেবে গেছে।

হঠাৎ ঐ ঘরে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। 'অন্ধকার হয়ে আসছে। আমি যাই।' বলল লক্ষ্মী।

'অন্ধকারে একা যাবে কি করে? আমি এগিয়ে দেব।' বলল রাজু।

'ওমা, কেউ যদি দেখে ফেলে!'

দেখলেই বা, আজ না হোক কাল তুমি তো আমার বউ হবেই।'

'তাই বলে রাত দিন গাঁটছড়া বেঁধে ঘুরে বেড়াবে নাকি?'

'আমি তাই ঘুরব। তোমার যদি তা পছন্দ না হয় এখনই বলে দাও।'

'আ! ও কি? কেউ দেখে ফেললে…!'

'দেখে দেখুক। তুমি আমার। ও সব দেখার ভার আমার। ভাল কথা, পরশু থেকে খাল পেরিয়ে সন্ধ্যের সময় ক্ষেতে আসছ কেন?'

'তরিতরকারির জন্য।'

'আহারে, এতগুলো লোক থাকতে, তোমার বাপ তোমাকেই ক্ষেতে পাঠাচ্ছেন তরকারি আনতে! তুমি যে কেন এদিকে আস, আমি তা জানি।'

'কেন আসি?'

'আমাদের এই নতুন বাড়ির কাজ কতখানি হল, কেমন দেখাচ্ছে তা দেখতে।'

লক্ষ্মী কোন জবাব দিল না।

'অত লজ্জা কিসের? দূর থেকে কি তোমাকে দেখা যায়? দিনের বেলা দেখলে তো তোমার লজ্জা। তাই, আজ সন্ধ্যায় এখানে ধরে আনলাম তোমাকে।'

মল্লির বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। ঐ দৃশ্য সে দেখতে পেয়েছে বলে নয়—! আসলে তার উপস্থিতিকে কেউ তেমন গণ্য করে না। লক্ষ্মীও না, তার বাওয়াও না। সে দেখছে জেনেও, কেউ সংকোচ বোধ করে না। মল্লি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তার চিঠির তাড়া ভর্তি খাম তার হাতেই ধরা ছিল। তার চিঠির খাম অথবা তাকে লক্ষ্মী বা রাজু দেখতে পায়নি। তবু সে অজানা আতঙ্কে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ঐ খাম বুকে রাখতে গিয়ে তার হাত কাঁপতে লাগল। কোমরের ঘাগরা ঢিলে

হয়ে গেল। ঘাগরা ধরতে গিয়ে চিঠির তাড়া নিচে পড়ে গেল। এক হাতে ঘাগরা আর অন্য হাতে চিঠিগুলো ধরে ঐ অন্ধকারে সে সোজা নাক বরাবর ছুটতে লাগল। ছুটছে তো ছুটছেই। কোন দিকে তার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। হঠাৎ একটা বাবলা কাঁটা তার পায়ে ফুটল। 'মাগো বলে' চিৎকার করে উঠল মল্লি। তার ছোটা থেমে গেল। দূর থেকে টর্চের আলো পড়ল তার ওপর। মুহূর্তে চিঠির থাম জামার ভিতরে সে পুরে ফেলল। ঘাগরার দড়িও কষে বেঁধে নিল সে।

'কে ওখানে?' রাজুর প্রশ্ন।

রাজুর গলা শুনে তার সমস্ত আশঙ্কা যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেল।

'আমি বাওয়া। কাঁটা ফুটেছে।' মল্লি বলল। তার গলা শুনে দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লক্ষ্মী। রাজু কাছে এসে কাঁটাটা হাতে ধরে টেনে তুলে ফেলে দিল। 'মাগো।' বলল মল্লি। ঐ ব্যথার মধ্যে যেন একটা আনন্দও ছিল। মনের কোন্ এক আনন্দের কাঁটাও যেন নাড়া খেল। আস্তে আস্তে মল্লি উঠল।

'বাড়িটা দেখা হয়েছে, লক্ষ্মীদি? চল এবার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'চল।' বলল লক্ষ্মী।

'তাহলে আমার যাওয়ার দরকার নেই?' জিজ্ঞেস করল রাজু।

তোমার যাওয়ার কি দরকার?' মল্লি বলল।

লক্ষ্মী মল্লাম্মা দেবীকে হাজার বার মনে মনে স্মরণ করল। কারণ হঠাৎ এখানে মল্লির দেখা পেয়েছে সে। মল্লি না থাকলে যতই অনুরোধ করুক না কেন রাজু ঠিক তাকে এগিয়ে দিতে তার বাড়ি পর্যন্ত যেত। সে যে কি ধরণের জেদি লোক তা সে জানে। বাড়ির সবাই তাকে ঠাট্টা করত। এক এক জন এক ধরণের কথা তাকে শোনাত। তার লজ্জার সীমা থাকত না। কোন কথাই সে মুখ ফুটে বলতে পারত না। সব চেয়ে বেশি মুখর বাড়ির মেয়ে সে।

রাজুর অনুমতির অপেক্ষা না করে মল্লিকে নিয়ে রওনা দিল লক্ষ্মী।

ট্রাক্টরের চাকায় লোহার শেকল লাগিয়েছে রাজু। জোরে ঘোরানোর

সময়, উপরে ওঠার সময় চাকা ঘুরতে গিয়ে যেন পিছলে না যায়। বড় একটা টিনের কৌটায় ভুট্টার বীজ ঢেলে নিল। রাজু ট্রাক্টরে উঠে বসল। কল টেপার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টর ডুর ডুর করে উঠল। তার আগে বত্রিশ একর জমি দু ঘন্টায় চষে দিয়েছে ঐ ট্রাক্টর। হাতির শুঁড়ের মত একটা চোঙ্গা লাগাল ভুট্টার বীজ রাখা বড় কৌটার গায়ে। শুঁড় ট্রাক্টরের পেছনের দিকে উঁচিয়ে রয়েছে। দু মিনিটের মধ্যে ট্রাক্টরটা ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গিয়ে পেছন ফিরল। ফেরার পূর্ব মুহূর্তে অন্য একটা কল সে আবার নাড়ল। বীজ ছড়ানো থেমে গেল। ঘোরার পর আবার যন্ত্রে রাজুর হাত পড়ল। আবার শুরু হল বীজ ছড়ানোর কাজ।

এক ঘন্টার মধ্যে বত্রিশ একর চষা জমিতে বীজ ছড়ানোর কাজ শেষ করল ট্রাক্টর।

'মামা, আপনার জমি চষে দেব?' রাজু জিজ্ঞেস করল।

'না, থাক্। ক্ষেত মজুর লাগিয়ে করে নেব।' বলল রাওয়াইয়া।

'আমি বলে ছিলাম না?' বলল ধর্মরাজু। 'এবার তোমাদের ভিক্ষে করে খেতে হবে। সুব্বাইয়া কাপু তিনশো একর জমি নিজে চাষ করে নিল। এবার দিন মজুর কি করবে? ক্ষেত মজুররা কি করবে? আমাদের রাওয়াইয়া কাপু প্রাচীন পন্থী তাই এই যন্ত্র দিয়ে চাষ করতে রাজী হয়নি। এই বিয়ে হয়ে গেলে, দুটো পরিবারের মেলামেশা হয়ে গেলে, রাওয়াইয়া আর কত দিন পারবে জামাইয়ের কথা না শুনে? যতই হোক জামাই বলে কথা। জামাই তেমন ভাবে বললে কোন শ্বশুর কি আর ফেলতে পারে? ভেঙ্কাম্মার যদি তেমন জিদ চাপে তাহলে কালকেই আর একটা ট্রাক্টর সে কিনে আনবে। তারপর আর কি পোঁটলা পুটলি বেঁধে গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া তোমাদের অন্য কোন পথ থাকবে না। সেই জন্যেই রাশিয়ার লোক বলেছে, ফসল সমান-সমান বন্টন করতে হবে।'

দীঘির ঘাটে অশ্বত্থ গাছের নিচে সান বাঁধানো জায়গায় বসে ধর্মরাজু সভা করছিল। সভাটা ডাকা হয়েছিল বিচিত্র ভাবে। চুট্টা টানতে টানতে, ঐ গাছ তলায় বসে, পথ দিয়ে যারা যাচ্ছিল তাদের এক এক করে সে ডাকল। তাদের সঙ্গে এ-কথা সে-কথায় তাদের ভাল মন্দের কথা জিজ্ঞেস করল। তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে জিজ্ঞেস করল ব্যক্তিগত সমস্যা। তারপর সে এল আসল প্রসঙ্গে।

ক্ষেত মজুর আর ভাগ চাষীদের মধ্যে আগে থেকেই একটা দুর্ভাবনার কালো ছায়া নেমে এসেছিল। সন্দেহ সংশয় আশঙ্কা প্রভৃতি ওদের মনে ক্রমশ পাথরের মত চেপে বসছিল। ধর্মরাজুর কথা শুনে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হল। পেন্টাইয়া প্রভৃতিরা গিয়ে সুব্বাইয়া কাপুকে যে সব কথা বলেছে তা বিস্তারিত ভাবে সে জানাল।

'উনি বললেন, এ বছর মজুরদের কমানোর কথা ভাবছি না। তোমরা যে যা পেয়ে থাক তা দিয়ে দেব। কে যেন তখন বলে উঠল, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে তার পরিবর্তে মুখে মাটি পুরে দিতে চান? তখন উনি রেগে গিয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, পরমুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে আস্তে আস্তে বললেন, ভাল চাষ আবাদ হোক তা কে না চায়। চাষ ভাল হলে দেশের মঙ্গল হয়। তবে কথা হল, এই কাজে সরকার যে যন্ত্র ব্যবহার করতে বলছেন! যন্ত্র ব্যবহার করলে তো আর এত লোকের প্রয়োজন হয় না। অগত্যা তোমাদের উচিত অন্য কোন কাজের খোঁজ করা।'

'তোমাদের চোখের জল মুছতে বলেছ? তোমাদের কথা শুনে, তোমাদের এড়িয়ে যেতে চাইলে, তোমাদের সাহায্য করতে না চাইলে, তোমরা কি করতে পার? আসলে ঐ দানব যন্ত্রটাকে এখানে আনাটাই কাল হল।'

দীঘির পশ্চিম দিকে মায়ের মন্দির। পূব দিকে অশ্বত্থের নিচে পঞ্চায়েত বসানোর জায়গা। সেখানে বসে করণম্ সভা চালাচ্ছিল। রঙ্গা লিঙ্গা ধারে বসে কলাম কুচি জলে ফেলছিল। ছোট ছোট ঢেউ উঠে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল। সকালে সন্ধ্যায় ওরা দুজনে

ওখানেই বসে। কাছেই ঘাট আছে। ঘাটের পাশে কাপড় কাচার কাঠ। মেয়েরা ঐ কাঠের উপর হাত তুলে তুলে কাপড় কাচে। ভরা কলসী হাঁড়ি বিচিত্র এক ভঙ্গিতে কাঁখে রাখে। ভেজা কাপড় ঠিক করতে করতে, এপাশ ওপাশ তাকাতে তাকাতে, মেয়েরা যে কি রকম করে, এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওরা দুজনে। খেয়াল চাপলে হঠাৎ ছোট খাট ঢিল ছুঁড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। ভাবটা, যেন ওরা ছোঁড়েনি। কিছু জানে না। ঘাটে কাপড় কাচতে বা জল নিতে যারা আসে তারা সাধারণ চাষী পরিবারের মেয়ে। তেমন অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়েরা ঘাটে আসে না। তাই গরিব ঘরের মেয়েরা রঙ্গাদের বাঁদরামির কথা বাড়িতে বলতে পারে না। বললেও বাড়ির ব্যাটা ছেলেরা রাওয়াইয়াকে সাহস করে কিছু বলতেও পারবে না। রঙ্গার খুঁটির জোরেই লিঙ্গরাজু নড়ে।

রঙ্গা রাবিকে দেখতে পেল। রাবি সবুজ ঘাসের ঝুড়ি মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছিল। রঙ্গা তার দিকে টিপ করে একটা ঢিল ছোঁড়ে। সেই ঢিল হাওয়ার জন্য একটু সরে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাটে উঠছিল গণাচারি। ঢিলটা গিয়ে পড়ল গণাচারির মাথায়। রঙ্গার ঢিল ছোঁড়া রাবি দেখতে পেয়েছিল।

'ও মাগো!' চিৎকার করে উঠল রাবি। তার মাথার ঝুড়িটা হঠাৎ নিচে পড়ে গেল।

'লাগেনি তো! অমন করছ কেন? বাচ্চারা হাত গুটিয়ে কি বসে থাকতে পারে?' বলল গণাচারি। রঙ্গা লিঙ্গরাজু যেখানে বসেছিল সেখান থেকে উঠে এল। রঙ্গাদের পক্ষে, সেখান থেকে সরে পড়া ছিল অস্বস্তি কর ব্যাপার। আবার যেখান থেকে ঢিল ছুঁড়ে ছিল সেখানেই বসে থাকা তাদের পক্ষে ছিল আরও বিরক্তি কর। লিঙ্গরাজুর খ্যাতি-অখ্যাতির কোন বালাই ছিল না। হঠাৎ সেখান থেকে উঠে, সোজা গিয়ে সে বাপের পেছনে বসল।

'না বাবা, রঙ্গাইয়া। অমন করে ঢিল ছুঁড়তে নেই। হঠাৎ চোখে

লাগলে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। মাথা ফেটে যেতে পারে।' বলল গণাচারি পিট পিট্ করে তাকাতে তাকাতে।

'প্রত্যেক দিন তো এই কম্মই করে, গণাচারি মশাই। এই ভাবে প্রত্যেক দিন সে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ মারে। ঢিল ছোঁড়ে।' বলল রাবি ঝুড়ি মাথায় তুলতে তুলতে।

'চুপ কর। যা মুখে আসছে তাই বলছ। অত বড় একটা ভদ্র পরিবারের ছেলে সম্পর্কে যা মুখে আসছে তাই বলবে? উঁ? এতবড় সাহস তোমার।' বলল ধর্মরাজু।

'ভদ্দর পরিবারের ছেলে হলেই হবে? ভদ্দর ব্যবহারের দরকার নেই?' বলে মুখ ঝামটা দিয়ে রাবি চলে গেল।

'ওর দেমাগ ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। ও সব ঐ সুব্বাইয়া কাপুর খুঁটির জোরে। বুঝি সব।' বলল লিঙ্গরাজু।

রঙ্গা চোখ কট্মট্ করে রাবির যাওয়া দেখছিল।

ভুট্টার গাছ বিঘৎটাক বড় হল। তিরিশ কাঠা জমি যেন সবুজ কাশ্মীরী আস্তরণে ঢাকা। প্রত্যেকটি গাছের উচ্চতা সমান। যত দূর দৃষ্টি যায় সবুজের বাহার। ভেঙ্কান্না খাটে বসে ক্ষেতের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ক্ষেতের ঢেউগুলো তার কাছে মনে হচ্ছিল যেন সৌভাগ্যের রেখাবলী। পঞ্চাশ একর জমির মাঝ খান দিয়ে চার একরের এক টুকরো জমি আছে সুরাপ্পা শাস্ত্রীর। ঐ জমিটা মিশিয়ে নিয়ে, মাঝের সীমারেখা গুলো তুলে দিয়ে, সব সমান করে চাষ করলে খুব ভাল হত। আর এই জমিতে যন্ত্র দিয়ে জল ছড়িয়ে দিলে কত ভাল হত। দূর, কাজের কাজ না করে, এখানে বসে বসে আজে বাজে চিন্তা করে কি লাভ? এই ঘাটে সকাল সন্ধ্যা বসে যা করছি তা করলে কি আর কোন লাভ আছে? জমির পাশ দিয়ে একটা রাস্তা, পাকা রাস্তা করে ফেলতে হবে। পাকা রাস্তা না হলে গাড়ি করে বউকে নিয়ে ক্ষেত দেখতে আসা যাবে না। তারপর একটা ধুম্সো বাচ্চা হবে। বাচ্চারা গাড়িতে বসে এদিক ওদিক তাকাতে ভালবাসে। আমার বাচ্চা তো আরও বেশি করে তাকাবে। এই মধুর স্বপ্নগুলোকে কার্যকরী করার

ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বাবা। সুব্বাইয়া কাপু ছেলের কথা শোনে। ছেলে যা বলে তাই সে করে। কিন্তু আমার বাবা শোনাতো দূরের কথা ওর ধার মাড়াতে চায় না। সুব্বাইয়া কাপুর নম্র স্বভাব দেখলে কেমন ভক্তি জাগে। আবার রাজুর এক গুঁয়েমি রীতিমত ঈর্ষার বস্তু। ওদের ক্ষেতের দিকে তাকালে গা জ্বালা করে। অনেক ক্ষণ ধরে এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে চুট্টা টানতে ভুলে গেল। চুট্টা নিভে গেল। সে রাগে সেটা মাটিতে জোরে ছুঁড়ে দিল। তার আঘাতে ছুটো ভুট্টার চারা ভেঙ্গে পড়ল। গোটা ব্যাপারটা কেমন ক্লান্তিকর লাগল ভেঙ্কান্নার কাছে। বাড়ি যাওয়ার জন্য সে উঠে পড়ল।

অন্ধকার হয়ে গেলেও রাবি ঘাস কাটছিল। তার ভরসা গঙ্গাপ্পা। অদূরে গঙ্গাপ্পা আমগাছের নিচে গাভীন গরু, যে বাছুরের জন্ম দেবে তার জন্য দড়ি পাকাচ্ছিল। রাবির ঝুড়ি ভর্তি হওয়া পর্যন্ত তার দড়ি পাকানো চলতে থাকবে। গঙ্গাপ্পা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ঘাস কাটাও চলতে পারে অত মোটা সোটা বিরাট লোকটা যে তার কাছে আসার ভাব ভঙ্গী করে অথচ আসে না এ ব্যাপারটা রাবির কাছে বেশ লাগে। গঙ্গাপ্পার ভয় পাওয়া দেখে রাবি কৌতুক বোধ করে। তার পাগলামি, সরল হাবা গোবা ভাব চমৎকার ফুটে ওঠে তার মুখে। গঙ্গাপ্পা ঐ মুখের ভাব নিয়ে তার কাছে অনেক ক্ষণ ঘুর ঘুর করে। কি যেন সে বলতে চায়। কি যেন করতে চায় সে। অথচ তার কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। রাবিকে দেখলে যেন তার গলা শুকিয়ে আসে। কি যেন করতে ইচ্ছে করে। হাত রগড়ায়। তাতে তার হাতের ময়লাই বেরোয় আর কিছু হয় না। তার ঘাড় মুখ সব ঘেমে যায়।

পাকানো দড়িটায় পাক বেশি হয়ে গেছে। কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। গঙ্গাপ্পা দাঁড়াল। রাবির কাছে যেতে হলে, ঘাটের দিকে একটু গিয়ে, পুকুরের ঘাটে উঠতে হবে। যাব কি ? না থাক। পাকানো দড়িটা বাঁ হাতে শক্ত করে সে ধরল। হাতের তালুতে দড়িটা ঘষাতে র‍্যাঁদার মত লাগল। ডান হাতে সে ধরল লাঠি। ছুটো মোক্ষম জিনিস ছু হাতে ধরে গঙ্গাপ্পার মনে একটু সাহস হল। সে ছু পা

এগিয়েই দেখতে পেল লিঙ্গরাজু ও রঙ্গা রাবির দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে।

'এই যে, ও মেয়ে, এক ঝুড়ি কচি ঘাসের দাম কত?' বলল রঙ্গা। হ্যাংলার মত এগিয়ে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে রঙ্গার জুড়ি নেই। সাধারণ কোন প্রশ্নকে কত রকমে যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করা যায় তা সে ভালভাবেই জানে। লিঙ্গরাজু ঘুরিয়ে বলা তো দূরের কথা কোন কথাই ঠিক মত বলতে পারে না। এ ব্যাপারে সে রঙ্গার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। রাবি কিন্তু রঙ্গার প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি। কোন কথা শুনতে না পাওয়ার ভাণ করে আপন মনে সে ঘাস কাটছিল। কাটা ঘাস ঝুড়িতে পুরে, চেপে চেপে, গুছিয়ে রাখছিল।

'আমি পুরে দেব?' জিজ্ঞেস করল রঙ্গা। রাবির জবাবের অপেক্ষা না করেই রঙ্গা ঘাস তুলে ঝুড়িতে রাখার সময় রাবির হাত চেপে ধরল। রঙ্গার গালে ঠাস্ করে একটা চড় বসল। ঐ চড় খেয়ে রঙ্গা ছিটকে গেল। লিঙ্গরাজু নিজের অজান্তেই পাঁচ হাত দূরে লাফিয়ে পড়ল। গঙ্গাপ্পা চমকে উঠে নিজের গালে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

'হারামজাদী, তোর দেমাগ তো কম নয়!' বলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে গেল রঙ্গা। কাস্তেটা হাতে তুলে নিল রাবি। রঙ্গা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'এর আগে গালে চড় কষেছি। এবার ঘাড় থেকে তোমার ধড়টা নাবিয়ে দেব।' বলল রাবি। রঙ্গা এক পা এক পা করে পেছনের দিকে যেতে লাগল। লিঙ্গরাজু পড়ে গেল বিপদে। রাবিকে ডিঙিয়ে তাকে যেতে হবে রঙ্গার কাছে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাবিকে ডিঙিয়ে যাওয়া মানে পৈত্রিক প্রাণটা সেখানেই রেখে যাওয়া। অহেতুক আর বিপদ না বাড়িয়ে লিঙ্গরাজু হঠাৎ পেছনের দিকে ঘুরে ছুটে পালাল। ঘুরেই সে দেখতে পেল গঙ্গাপ্পাকে। বিরাট দেহী গঙ্গাপ্পাকে এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে কড়া পাক দেওয়া দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লিঙ্গরাজু ভেবে পেল না কি করবে! কোন্ দিকে পালাবে! এক দিকে কাস্তে হাতে রণচণ্ডী অন্য দিকে লাঠি আর দড়ি

হাতে একটা হাতি ! কি ভেবে ঝপ্ করে সে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল। ভয় পেলে কি মগজ কাজ করে ! কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে পুকুরের অন্য পাড়ে উঠল লিঙ্গরাজু। সেখান থেকে এক নিশ্বাসে ঐ ভেজা কাপড়েই মাঙ্গির বাড়ি পর্যন্ত সে সোজা দৌড় দিল।

'কে-এ-ফেটে গেছে !' বলল গঙ্গাপ্পা। বিশাল গাছের মত অতবড় লোকটা হাসতে হাসতে একেবারে নুয়ে পড়ল। হাসিতে লুটোপুটি খেতে খেতে কী যে বলল কিছুই তেমন বোঝা গেল না। তার মুখের কথা মুখেই টগ্‌বগ্ করে ফুটতে লাগল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে যে শব্দ বেরিয়ে এল তা হল 'রঙ্গা, রাবি, লিঙ্গরাজু···ফেটে গেছে' প্রভৃতি। কি যে ফেটে গেছে কেউ ঠিক বুঝতে পারল না। তবু সুব্বাইয়ার বাড়ির সবাই বোঝার মত ঘাড় নাড়ল আর তার হাবভাব দেখে হাসতে লাগল।

ছেলের গলা শুনেই ধর্মরাজুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। এই হারাম জাদাটা এমন বেয়াড়া সময়ে আসে যে বলার নয়। তক্ষুনি ঘানি থেকে মাঙ্গি নাবল। তার ঠাকুরপো পুকুরে গেছে তিল ধোওয়ার জন্য। আঁচলের কোন ধরে ঘরের ভেতর যাওয়ার জন্য তাকে টানছিল ধর্মরাজু। সে বলছিল, 'আঃ ! ছাড়, একি ! তোমার জ্বালায় আর পারি না!' বলতে বলতে তার পেছন পেছন যাচ্ছিল মাঙ্গি। ঠিক সেই সময় দূর থেকে শোনা গেল লিঙ্গরাজুর গলা। তৎক্ষণাৎ মাঙ্গির আঁচল ছেড়ে, তেলে বেগুনে চটে গিয়ে, তেড়ে এল সে লিঙ্গরাজুর কাছে। লিঙ্গরাজুকে ভেজা জামা কাপড়ে কাঁপতে দেখে ধর্মরাজুর রাগ মুহূর্তে জল হয়ে গেল।

'কিরে বাবা, কি হয়েছে তোর ?' জিজ্ঞেস করল ধর্মরাজু।

'মে-মে-মেরেছে।' বলল লিঙ্গরাজু। সে তখনও হাঁপাচ্ছিল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে ভয়ে অথবা শীতে কাঁপছিল।

'কে মেরেছে ?' ধর্মরাজু উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল।

'রাবি।'

'সে কি ! তোকে রাবি মেরেছে ?'

'আমাকে না, রঙ্গাকে।'

কি যে ঘটেছিল তা কিছুটা বোঝার পর ধর্মরাজু তাড়াতাড়ি চলে গেল। ছেলেকে শান্ত করার ভার মাঙ্গিকে দিয়ে হন্ হন্ করে সে চলে গেল। একটি ছোট জাতের নিচু স্তরের মেয়েছেলে অতবড় ঘরের রঙ্গাকে মেরেছে! এর একটা বিহিত করতেই হবে। আর ওখানে বসে থাকা চলে না। এর চেয়ে বড় কাজ আর কিছু হতে পারে না। এই ধরণের বিপদের সময় ধর্মরাজু নিজের সমস্ত সুখ দুঃখের কথা, আরামের কথা ভুলে গিয়ে থাকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সে প্রতিকারের চেষ্টা করে।

যা ঘটেছিল রাবি তা আগা পাস্তলা তার বাবা মাকে বলতে লাগল। পান্দালুর ভেতরে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। তার রাগ দেখে ভয় পেল রাবির মা পুল্লী। সে মেয়েকে কখন ইশারা করে আবার কখন বকে সাবধান করে দিচ্ছিল।

'বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে গণ্ডগোল না পাকিয়ে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইয়ে করতে পারলি না।' বলল পুল্লী।

'ইয়ে আবার করবেটা কি? মেয়ে তোমার কি করবে? ওর পাশে তোমার মেয়েকে শুতে বলবে না কি?' বলল পান্দালু।

'সব ব্যাপারে তোমার ঐ চণ্ডালের রাগ চলে না! আমি বলছিলাম কি, রাবি, তুই নিজে হাত তুলতে গেলি কেন? বড়দের বললে ও নিজেই শুধরে যেত।' বলল পুল্লী।

'ওর বড়দের বলার সময় কি চলে গেছে না কি? আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বলতে। আর কোন দিন যদি এসব করতে আসে একেবারে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।' বলে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পান্দালু।

দাওয়ায় বসে রঙ্গা, ভেঙ্কাম্মা ও ধর্মরাজু তখনকার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল হাল্কা মেজাজে।

'তা নয় ভেঙ্কাম্মা, আমার কথা হল, কি এমন ঘটে গেছে যে অত হৈ চৈ করছে। রঙ্গা চার জনের সঙ্গে মিশতে চায়। আর চার জনের মত গুটিয়ে কুঁই কুঁই করে সে জীবন কাটাতে চায় না। ভাল মনেই হয়ত সে কোন কথা বলেছে, আর তাই নিয়ে অত পাড়া মাথায় করার কি আছে? বলি সামান্য ব্যাপার নিয়ে এই ধরণের কথা কাটাকাটি, হৈ

হৈ, কোন দিন হয়েছে ? বড় কর্তা ডাকছে শুনলে, যে কোন মেয়ে ছেলে হাতের কাজ ফেলে, ছুটতে ছুটতে, উড়তে উড়তে, চলে আসত না ? কি এমন ঘটেছে যে অমন বর্বরের মত সে হাত তুলল। বলি, দেশে কি আমাদের মান সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না ! আমার কথা হল, তোর সঙ্গে কেউ যদি রসিকতা করতে গিয়ে থাকে, তোর যদি ভাল না লাগে, ভদ্রভাবে, শান্ত ভাবে বল, বাবু আমার সঙ্গে ওরকম করবেন না। তা না একেবারে হাত তোলা !' ধর্মরাজু বলল।

'দাঁড়াও না ওর মজা দেখাচ্ছি। ওকে আমি যা করব না, জীবনে তা সে ভুলতে পারবে না।' রঙ্গা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

'চুপ কর। রাবির বাবা টের পেলে চামড়া খুলে নিত। ওসব ইয়ার্কি ঠাট্টা লোকটা একদম পছন্দ করে না। সামান্য গোলমাল লক্ষ্য করলে কেমন তেড়ে আসে!' বলল ভেঙ্কায়া।

ওর বাবা সব জেনেছে। মেয়ের কাছ থেকেই সে শুনেছে।

'কিরে রঙ্গা ?' দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে দ্রুত আসছিল রাবির বাবা পাদ্দালু।

'যা শুনেছি, তা কি সত্য ?' রঙ্গাকে জিজ্ঞেস করল রাওয়াইয়া।

'তা নয় বাওয়া। ওটা একটা সাধারণ ছেলে-মানুষী বলতে পার। ঐ বয়সে আমরা কত কাণ্ড করেছি, বল ?' যা হয়ে গেছে তা স্বাভাবিক হিসেবে প্রমাণ করার তাল করতে লাগল ধর্মরাজু।

'তুমি একটু চুপ করতো। আমাকে সরাসরি জানতে দাও। কি রে চুপ করে আছিস কেন ? কথা বল।' রাওয়াইয়া বলল।

'আজ্ঞে তেমন কোন খারাপ কথা বলিনি। ঘাস কাটার সময় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক ঝুড়ি ঘাসের দাম কত, এই যা।' আদুরে ছেলে, বাপের কোলে বসে, মুখ ফুলিয়ে বলার মত বলল রঙ্গা।

'ঘাসের দর জানার কোন দরকার ছিল ? ভাত ছেড়ে এবার থেকে ঘাস খাবি না কি ?'

'কত্তা বাবু, এই আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাঁয়ের লোক অনেক কিছু সহ্য করে। মুখ বুজে থাকে। ঘাটে, হাটের দিনে এরা

যা সব ছ্যাবলামো করে, মেয়েদের যে ভাবে হেনস্তা করে, তা দেখলে গা রি রি করে। গাঁয়ের গরিব মানুষ গুলোর বাড়ির মেয়েদের নিয়ে এসব করা সহ্য করি শুধু আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু আপনারা বলুন আর কতদিন এ সব আমরা সহ্য করব?' ক্ষোভের স্বরে বলল পান্দালু।

'তোমার সাহস তো কম নয়। এত বড় কথা তুমি বললে আমাদের সামনে? এই ভাবে কথা বলার সাহস কোত্থেকে পাও তোমরা?' বলল ধর্মরাজু।

'তোমার যা জানানোর জানিয়েছ। এবার যাও।' বলল রাওয়াইয়া। একজন চাষীর মুখে এমন কড়া কথা ভাল শোনাল না রাওয়াইয়ার কাছে। ধর্মরাজুর কথায়, পান্দালুর রাগ আরও বেড়ে গেল। সে আরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'কত্তাবাবু, আমরা যতই গরিব হই, আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে। খিদে সহ্য করতে পারি, কিন্তু ইজ্জৎ নস্ট করতে পারিনা। এই শেষ বার বলে যাচ্ছি আবার যদি এই ধরণের কিছু হয়···ভাল হবে না···একটা ইস্‌পার উস্‌পার হয়ে যাবে।' শেষ কথাটা বলার সময় তার হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় ধরা ছিল।

'বলে কি? আঁ্যা! কি রে তোর এত তেল হয়ে গেছে। সুব্বাইয়া কাপুর খেয়ে তোর এত দেমাগ হয়েছে, আঁ্যা?' বলল ভেঙ্কায়া। তাকে সমর্থন না করলেও রাওয়াইয়ার রাগ হল। সে বলল, 'আমি যখন জিজ্ঞেস করছি তখন তুই মুখ নাড়ছিস কেন বান্‌চোৎ। কে বলেছে তোকে এখানে কথা বলতে? উঁ! বুড়ো হাবড়া হয়েছিস এখনও তোর এইটুকু জ্ঞান হল না?'

'আজ্ঞে ছোট বড় জ্ঞান আছে বলেই আপনার কাছে ছুঁটে এসেছি।' বলে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল পান্দালু। যাওয়ার সময় পান্দালু যা বলে গেল তাতে তার নত বা নরম হওয়ার কোন লক্ষণ না ফুটে ওঠায় রাওয়াইয়ার রাগ আরও বেড়ে গেল। সেই রাগ পড়ল গিয়ে রঙ্গার উপর। গোটা ব্যাপারটাকে হাল্কা ভাবে দেখায় ধর্মরাজুকেও রাওয়াইয়া রাগের মাথায় কড়া কথা শুনিয়ে দিল।

'খাটের মড়া কোথাকার ! আমাদের ইজ্জৎ বলে আর কিছু রাখবি না। একটা মেথরের কাছেও যা নয় তাই শুনতে হবে। এর চেয়ে জলে ডুবে মরা অনেক ভাল ছিল।'

'বলি কিসের জন্য অমন অলুক্ষণে কথা বলছ শুনি?' বলতে বলতে এল সুরালু।

'আঁতুড় ঘরের বাচ্চাটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে মারা গেছে ওর মা।'

'আর সেই জন্য, যত কেচ্ছাই করুক না কেন, সব সহ্য করতে হবে? চুপ করে বসে থাকবে? কোন দিন দেখা যাবে হাত পা ভেঙ্গে কোথাও ফেলে রেখেছে।' বলল রাওয়াইয়া।

'ওহে বাওয়া, কি যত সব আজে বাজে কথা বলছ, বুঝি না। খারাপ কিছু করিনি বলে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, তার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। যত সত্যবাদী ঐ পান্দালু।' বলল ধর্মরাজু।

'ওর কথা বিশ্বাস করে...' আরও কি যেন বলতে গেল ধর্মরাজু।

'আগে তুমি এখান থেকে সর দিকি। যাও এখান থেকে। আসলে তুমিই এদের খারাপ হওয়ার মূলে।' বলল রাওয়াইয়া। ধর্মরাজু হাসতে হাসতে কথাটা কানে তুলল না। খারাপ কথা বা গালাগাল গায়ে না মাখার কৌশল অনেক দিন ধরে, চর্চা করে, অভ্যেস করেছে ধর্মরাজু। স্বামীর অবস্থা দেখে সুরালু ভাঙা গলায় কাঁদতে কাঁদতে কি যেন বলতে গেল।

'তুমি ঘরে যাও বোন। বাওয়ার রাগ যে কি রকম, তাতো তুমি জান। যাও, ভেতরে যাও।' বলে সুরালুকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল ধর্মরাজু। তারপর রাওয়াইয়ার হাত ধরে আস্তে আস্তে বাড়ির চত্বরের বাইরে, দূরে নিয়ে গিয়ে, আস্তে আস্তে সে বলল, 'ছেলেটা তো আর ঘর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়নি। আমরা যেমন ঐ বয়সে ঘাসে মুখ রেখে চলিনি, ওরাও চলছে না। গাঁয়ের নরসাম্মা ধাইকে তুমি ডেকে পাঠাতে। কেন যে ডেকে পাঠাতে তা কি কারো অজানা আছে? এখনকার যুবকরা ভাল ভাবেই জানে কখন কি করতে হয়। তাই,

আগা-পাস্তলা না ভেবে, কথায় কথায়, অত চটে গেলে, চলবে কেন ? ধীরে সুস্থে কি ভাবে, কি করলে যে কি হবে তা ভাবতে হবে বৈকি ! এমন ভাবে সব কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও যেন না ভাঙে।'

রাওয়াইয়ার সঙ্গে নরসাম্মা ধাইয়ের ভালই আলাপ ছিল। বাড়িতে ঐ ধাইকে দু একবার আনতে হয়েছিল প্রসব করানোর জন্য। সদ্যজাত শিশুর মৃত্যুতে রাওয়াইয়ার মনে দুঃখের যে জগদ্দল পাথর চেপে ছিল নরসাম্মা তা কিছুটা সরিয়ে ছিল। সে তখন তার মন হাল্কা করেছিল। তার মন মেজাজ ভাল করে দিয়েছিল। রাওয়াইয়ার মন হাল্কা করার জন্য ধাই যা করেছিল তার কয়েকটা ঘটনা রঙ্গা, আড়ালে আবডালে থেকে, দেখে নিয়ে ছিল। অনেকদিন পরে, রঙ্গা যে গোটা ব্যাপারটা জানে তা রাওয়াইয়া জেনেছিল। তারপর থেকে, যেহেতু তার জীবনের এত বড় একটা কেচ্ছা সে জেনে গেছে সেই হেতু রঙ্গাকে খাতির করতে লাগল রাওয়াইয়া। বহুদিন রঙ্গার মাধ্যমে ধাইয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে ছিল রাওয়াইয়া। জ্যাঠা মশাই, যখন তাকে এত বিশ্বাস করে, তখন রঙ্গাও খবর পাঠানোর কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করে গিয়েছিল। সেই জন্য, সে যাই করুক না কেন রাওয়াইয়া কোন কথা তার বিরুদ্ধে বলতে পারে না। কিচ্ছু করতে পারে না। সে যে পারে না তা রঙ্গাও ভাল ভাবেই জানে। রঙ্গা যতই অস্থানে কুস্থানে ঘুরুক না কেন রাওয়াইয়া বাধা দিত না। তার কথা হল, যেখানে ইচ্ছা ঘোর, যা ইচ্ছা কর, কিন্তু গাঁয়ে যেন তা না রটে।

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী। উৎসবের দিন। বড় আনন্দের দিন। বহু লোক বহু ভাবে দিনটিকে পালন করে। দুটো জমিদার পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সেই দিনই ঠিক হবে। পাকা কথা হবে সে দিন। এ ছাড়া সেদিন নবান্নেরও উৎসবের দিন। যত ধান হয়, বস্তা পিছু এক মুঠো করে ধান নিয়ে সবাই যায় মল্লম্মা দেবীর মন্দিরে। গাঁয়ের সমস্ত লোক ভেঙ্গে পড়ে মন্দিরে। প্রত্যেকটি পরিবারের লোক একটা তাল পাতার ঝুড়িতে মল্লম্মা দেবীর সামনে কালো মাটি ঢেলে তার উপর মন্ত্র-

পড়া জল ছিটিয়ে, নতুন ধান, সেই কালো মাটিতে বেশ করে মেখে নেয়। তারপর ছোট ছোট দলা পাকিয়ে ঐ ঝুড়িতে রাখে। অমাবস্যার দিন, মল্লম্মার বিশেষ পূজোর দিন। তার আগে নতুন ধানের শীষ গজায়। যে ঝুড়িতে চারা গজায় সে গুলো ঐ উৎসবের দিন মন্দিরের উপর সাজানো হয়। এক একটা পরিবারের নামে সেগুলো রাখা হয়। এক মাসের মধ্যে মন্দিরের চূড়া দেখে মনে হয় যেন সবুজ মুকুট পরানো হয়েছে মন্দিরের মাথায়।

লক্ষ্মী এবং রাজু দুজনে দুটো ঝুড়ি হাতে করে এল মল্লম্মার মন্দিরে। এ-পাশে ও-পাশে ছটো পরিবারের লোক দাঁড়াল ঘন হয়ে। মল্লম্মা দেবীর কাছে। জ্বলন্ত প্রদীপের আলো পড়ে কালো পাথরের থাম চিক চিক করছিল। গুঁড়ো করা কালো মাটি, রাজু আর লক্ষ্মী যে যার ঝুড়িতে ঢেলে নিল। গণাচারি নতুন ধানের পোঁটলা খুলে দেবীর পায়ের কাছে রাখল। সে চোখ বুজে, জোড় হাত করে, মৌন ভাবে থেকে, মনে মনে প্রার্থনা করল। কলসীর মন্ত্র পড়া জল সে যখন ঢালছিল তখন রাজু আর লক্ষ্মী ঝুড়িতে হাত দিয়ে ঝুড়ির আনাচে কানাচে যাতে জল যায় তার জন্য হাত নাড়াচ্ছিল। তারপর সাবধানে মল্লম্মা দেবীর পায়ের কাছে রাখা ধান এনে গণাচারি লক্ষ্মীর হাতে একটা পুড়িয়া আর রাজুর হাতে অন্য পুড়িয়া দিল। দু জনেই পুড়িয়া খুলে তার ধান ঝুড়িতে ছড়িয়ে দিল। অত লোকের মধ্যে রাজুর পাশে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্মীর সঙ্কোচ লাগছিল। লজ্জা ভয় উদ্বেগ সঙ্কোচ আর কিছুটা আনন্দ সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল লক্ষ্মীর মনে। তার হাত মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। দু চারটে ধান নিচে পড়ে গেল। এটা মস্ত বড় অলক্ষণের ঘটনার মত লাগল তার কাছে। গণাচারি ঐ ধান চারটে কুড়িয়ে ঝুড়িতে রেখে দিল। রাজু আর লক্ষ্মী সাস্টাঙ্গে প্রণাম করল মল্লম্মা দেবীকে। দুজনে দুটো ঝুড়ি হাতে করে এল মন্দিরের

বাইরে। মন্দিরের বাইরে, গাঁয়ের সবাই ভেঙ্গে পড়েছিল। পূজোর যেন বড় আকর্ষণ সুব্বাইয়া ও রাওয়াইয়া পরিবারের বৈবাহিক বন্ধনের ব্যাপারটা। মায়ের মন্দিরে এই পূজো প্রত্যেক বছর হয় কিন্তু এই দুই পরিবারের এই ধরণের মিলনোৎসব এর আগে কোন দিন হয়নি। এইবারই হচ্ছে।

'তাহলে আমাদের পায়েস পিঠে খাওয়াচ্ছেন কবে বাওয়া?' জিজ্ঞেস করল কোমাটি হনুমন্ত।

'এই মায়ের মন্দিরের ব্যাপারটা চুকে যাক। অমাবস্যার পরেই লগ্ন।' বলল রাওয়াইয়া।

বৌদি আর মল্লি দুজনে দুদিকে হাত ধরাধরি করে লক্ষ্মীকে বাড়ি নিয়ে গেল।

'তাহলে তার আগে মায়ের মন্দির রঙ করিয়ে নেব।' বলল ভেঙ্কায়া।

'কতখানি কি লাগবে হিসেব করে দেখ। শহর থেকে ভাল রঙ আনানো উচিত।' বলল রাওয়াইয়া।

'আমি মন্দিরের চার পাশে মণ্ডপ বাঁধিয়ে দেব।' বলল সুব্বাইয়া।

'মণ্ডপ পরে হলেও চলবে, আগে ঠিক করুন কোন্ রঙ লাগাবেন। কালো পাথুরে রঙটাই মন্দিরের গায়ে সুন্দর দেখায়।' বলল রাজু।

'ও কি কথা বলছ? ছবিগুলোর যেটাতে যে রঙ আছে সেটাতে সেই রঙ লাগানোইতো ভাল। ছবিগুলো ভাল ভাবে ফুটে উঠবে। সব জায়গায় পাথুরে কালো রঙ লাগালে মন্দিরের শোভাই নষ্ট হয়ে যাবে।' বলল রাওয়াইয়া।

'তিরুপতি মন্দিরেও তো ঐ রঙ লাগিয়েছে।' বাপের মণ্ডপ বাঁধানোর কথাকে আমল না দেওয়া এবং রাওয়াইয়ার প্রস্তাবিত রঙ অপছন্দ করা ভেঙ্কায়ার ভাল লাগল না। দুটো পরিবারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব আনতে পারলে কত ভাল হত! উভয় পরিবারের উৎসাহ কত বাড়ত। গাঁয়ের সবাই বলাবলি করত ওদের কথা। রাওয়াইয়া একটা বিদ্যালয়ের জন্যে জমি দিয়েছিল। সুব্বাইয়া বিদ্যালয় তৈরি করালো। রাওয়াইয়া দীঘি খোঁড়াল। সুব্বাইয়া তার ঘাট বাঁধালো। পঞ্চায়েত

বোর্ডের প্রেসিডেন্টের পদে যে কোন একজন বসত। একে অন্যকে বসাত। একমত হয়েই ওরা তা করত। ওরা গাঁয়ের দশজনের ভালর জন্য যে কাজে হাত দিত তা প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে করত। কারো মধ্যে কোন ঈর্ষার ভাব থাকত না। ভাল কাজ করবে, চার জনে ভাল বলবে, এই ছিল ওদের মূল লক্ষ্য। এই কাজ করতে গিয়ে কোন দিন ওদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়নি। কারো পেছনে কেউ, একে অন্যকে, নিন্দে করেনি। রাওয়াইয়া ও সুব্বাইয়া দুজনেই অভিমানী। দুজনেরই কিছুটা গর্ব ও অহঙ্কার আছে। তবে দু জনের মধ্যে রাওয়াইয়ার পরিচিতি, ক্ষমতা ও গোঁয়ার্তুমিটা একটু বেশি। আবার সুব্বাইয়ার নম্র স্বভাব ও নরম মেজাজের কথাও গাঁয়ের মানুষের কাছে সমধিক প্রচারিত ছিল।

রাজু আর কথা না বাড়িয়ে নতুন ধানের ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

'আপনার জামাই, এমন সব কথা বলে যে ভাল লোকেরও মাথা ঘুরে যায়। সবাই পূব বললে ও বলবে পশ্চিম।' বলল ধর্মরাজু।

'যাক, তোমার মত এর কথা ওকে আর ওর কথা তাকে লাগিয়ে, তিলকে তাল করে, ঝগড়া লাগিয়ে দেয় না।' বলল পুন্নাইয়া।

'রাজু নিজে যা সত্য বলে জানে তা সে বলে দেয়। কে কি বলল, স্বীকার করল কি অস্বীকার করল তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা থাকে না। যা বলার ছাঁট কাট সে বলে দেয়।' বলল সুব্বাইয়া।

'শুধু তাই নয় সে যা করব বলে, করে। কাজে তার উৎসাহ আছে। সততা আছে।' জামাইকে সূক্ষ্ম ভাবে প্রশংসা করল রাওয়াইয়া।

'অন্যের সমালোচনা করার বেলায় যতই নির্ভীক আর সাহসী হোক না কেন একেবারে নিজের বেলায় হলে অত সততা আর সাহস থাকে না। নিজের বেলায় আঁটিশুঁটি পরের বেলায় চিমটি কাটি। আমার কথা হল, পণ নেওয়ার ব্যাপারে যে এতটা বিরোধী সে বত্রিশ একর জমিই বা নিতে রাজী হয় কি করে? জমি নেওয়াটা কি পণ নেওয়া নয়?' বলল ধর্মরাজু।

এই জমি দেওয়ার ব্যাপারটা সারা গাঁয়ে প্রচারিত হওয়ায় রাওয়াইয়ার

ভালই লাগছে। তবে এই ব্যাপারটা রাজু এখনও জানে না। রাওয়াইয়া ও সুব্বাইয়ার মধ্যেই শুধু কথা হয়েছিল। ব্যাপারটা গাঁয়ের সবাই জানুক কিন্তু রাজু একবার জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। বাপকে তো যা নয় তাই বলবে উপরন্তু তাকেও দুকথা শোনাতে ছাড়বে না। অথচ একেবারে তেমন কিছু না দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলে দশজনের কাছে নিজেরই বদনাম। লোকেই বা কি বলবে! সুব্বাইয়া নিমরাজী ছিল জমি নেওয়ার ব্যাপারে। দ্বিধা ছিল তার মনে। রাওয়াইয়াই অনেক রকম কথা বলে, ব্যাপারটা গোপন থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাতেও রাজী না হলে রাওয়াইয়া বলে ছিল, 'বেশ তো, তোমার ছেলেকে জমি দিলে, তোমার যদি মত না থাকে, আমি আমার মেয়ের নামে লিখে দেব। তাতে তো তোমার আপত্তি করার কিছু নেই!' তবু, আজ দশ জনের সামনে ধর্মরাজু এই কথা বলায় রাওয়াইয়া হাঁক পাঁক করে বলল, 'রাজুতো পণ নিতে রাজী হয়নি। আমার মেয়েকে আমি দেব ভেবেছি। যা ভেবেছি তা সুব্বাইয়াকে কথায় কথায় জানিয়েছিলাম।' বলল রাওয়াইয়া।

'জামাইকে দিলে টাকার এ-পিঠ আর মেয়েকে দিলে টাকার ও-পিঠ। মেয়ে যখন শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে তখন মেয়ের নামেই থাক আর জামাইয়ের নামেই থাক, জমি তো ঐ পরিবারেরই হোল।' মাথা নেড়ে নেড়ে বলল ধর্মরাজু।

এই ব্যাপারটা জানতে পারলে রাজু যে এই ধরণের কথাই বলবে এবং মেয়ের নামে লিখে দিতেও যে সে বারণ করবে তা সে জানে। আবার ধর্মরাজু নিছক খুঁচিয়ে ঘা করার জন্যই যে বলছে তাও রাওয়াইয়া জানে।

'করণম্, নিজের ছেলের জন্যই তুমি যখন ভাল হোক, মন্দ হোক, একটি পাত্রী জোগাড় করতে পারনি তখন তোমার কী দরকার অন্যের বিয়ের ব্যাপারে এতটা নাক গলানোর?' পাল্টা খোঁচা দিল রাওয়াইয়া। কোন খোঁচাকেই তোয়াক্কা করার পাত্র করণম্ ধর্মরাজু নয়। সে কানেও তোলে না কোন খারাপ কথা, গায়ে মাখেনা কোন দুর্ব্যবহার। কিন্তু

রাওয়াইয়া 'করণম্' বলে যখন সম্বোধন করেছে তখন ধর্মরাজু বুঝতে পারল যে এবার সে মনে মনে চটেছে।

'সেই বিষয়েই তোমার পরামর্শ নেব ভাবছিলাম বাওয়া। আমি কোন ক্রমেই পাত্রী জোগাড় করতে পারিনি। তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও। তুমি চেষ্টা করলেই ছেলের আমার একটি পাত্রী জুটে যাবে। তুবেলা আর কত বছর রান্না করতে বসে হাত পোড়াব। এই বুড়ো বয়সে, উনুনের ধোঁয়া কি এই পোড়া চোখে সহ্য হয়, বাওয়া। দশ বছর ধরে একা রান্না করছি। তুবেলা আর কত বছর এই হাত পোড়াব, বাওয়া? যে বাড়িতে মেয়েছেলে নেই সে বাড়ি শ্মশানের মত।' আরও কত কি বলল সে বিড় বিড় করে। করণমের আর কোন কথা সত্য হোক বা না হোক এটা কিন্তু সত্য। জীবনে অনেকের সঙ্গে, অনেক রকমের কারবার করলেও, অনেকের সর্বনাশ করলেও, এই একটি বিষয়ে সে বড় তুর্বল; বড় নিরুপায় মনে করে সে নিজেকে। তার এই তুঃখের কথাগুলো বলার সময় তাকে করণমের মত দেখায় না। তার মুখে ফুটে ওঠে একটা সাধারণ মানুষের ছাপ। তার সেই সকরুণ চোখ মুখের ভাব দেখে রাওয়াইয়ার মনে কেমন করুণা জাগল। লজ্জাও সে পেল। তুর্যোধনকে আঘাত ক'রে, ফেলে দিয়ে, ভীম যে ধরনের লজ্জা পেয়েছিল সেই ধরণের লজ্জা। ধর্মরাজুর যেখানে ঘা ঠিক সেই খানে জোরে যেন টিপল রাওয়াইয়া। যে পরিবেশে তাকে বা তার জামাইকে হেয় করার চেষ্টা করল ধর্মরাজু সেই পরিবেশেই তাকে নাকি-কান্না কাঁদাতে পেরে মনে মনে খুশী হল রাওয়াইয়া।

'যাক, সে পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন। রাত্রে ফলাহার করতে এস। লিঙ্গরাজুকেও নিয়ে এস। এক্ষুনি তোমাকে ভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করছি না। তাহলে গাঁ ময় রটে যাবে।' বলল রাওয়াইয়া।

'বাওয়া, কি যে মাঝে মাঝে ছেলে মানুষের মত কথা বল। আমরা না এসে পারি? আমরা যাতায়াত না করলে ঘটনা এগোবে কি করে?' বলল করণম্।

'তাতো বটেই, তুমি হলে গিয়ে নৈবেদ্যের মাথার সুপুরি।' বলল সুব্বাইয়া।

ঐ কথা শুনেই করণম্ দাঁত বের করে ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসল।

রাওয়াইয়ার বাড়ির সামনে বহু মানুষের ভীড়। লোকজন একেবারে কিলবিল করছে। দুটো বড় বারান্দা আর আঙিনায় বহু লোক বসে পড়েছে। রাওয়াইয়া আর সুব্বাইয়ার পরিবারের লোকজন তো আছেই, গাঁয়ের মাতব্বর গোছের লোকজনও বসে ছিল বারান্দায়। মেয়েরা সবাই বসেছিল বড় দরজার পেছনে এবং চারটে জানলার ওপাশে।

গ্রামের দেবী মল্লম্মা মেথরের কন্যা হওয়ায় মল্লম্মাদেবীর উৎসবের মাসে, পুরো এক মাস, মেথরদের ছুঁলে দোষ হয়না। কাপড় জামা অশুদ্ধ হয়না। ঐ মাসে মেথররা ইচ্ছে করলে যে কোন লোকের বাড়ির ভেতর ঢুকতে পারে। সবাইকে ছুঁতে পারে। রাওয়াইয়া ওদের সবাইকে তাড়ি খাওয়াল। দশটা পাঁঠা বলি দিয়ে ওদের ভাত মাংস পুলুসু (তেঁতুল গোলা ফোটানো ও ফোঁড়ন দেওয়া জল) খাওয়াল। যতক্ষণ না যা খেয়েছে তা হজম হয় ততক্ষন প্রাণ ভরে তারা নাচে। যখন তাদের মাথা ঘোরে, আর নাচতে পারেনা, তখন থেমে যায়। ওদের এই নাচ গান মল্লম্মা দেবীর বাৎসরিক উৎসবের প্রথম দিনেই হয়ে থাকে। তবে এ বছর গাঁয়ের দুই বড় পরিবারের বিয়ের ব্যাপার থাকাতে তা কিছুদিন পরে হল। আজকের খরচ ছিল সুব্বাইয়ার।

গোলার পিছনে কুটনো কোটার ঘর আছে। সেই ঘরে শিল্পীরা সাজছিল। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি তরুণ তরুণী সবাই, 'মা, মল্লিদেবী, মা, আমাদের দেখ মা। আমরা যেন ভাল ভাবে বছরটা কাটিয়ে দিতে পারি, মা মাগো…' বলে গান গাইতে গাইতে এক সঙ্গে পা ফেলে ফেলে রঙ বেরঙের পোশাক পরে এল। গ্যাস বাতির আর হ্যাজাগের আলোর আধিক্যে দিনের মত হয়ে গেল গোটা অঞ্চলটা। ইলেকট্রিক বাতি গুলো ঐ আলোর সামনে মিইয়ে গেল। দীপ্তি হীন প্রদীপের আলোর মত দেখাল ঐ বৈদ্যুতিক আলো।

ওদের গাওয়া গানের মধ্যে ছিল মায়ের গাথা, স্মরনিকা ও স্তুতি।

একশো বছর আগে মেখর পাড়ায় মল্লম্মার আবির্ভাব ঘটেছিল। একটি গ্রামের এক কুঁড়ে ঘরে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠেছিল সুন্দরী সোনার প্রতিমার মত রূপবতী, মল্লম্মা, বাচ্চা বয়স থেকেই তার মন পড়ে থাকত বাইরে। চার জনকে উপকার করার জন্য তার মন সব সময় হাঁক পাঁক করত। জ্যোতিষীপণ্ডিতরা মল্লম্মাকে দুর্গার নতুন অবতার বলে বর্ণনা করে ছিল। মল্লম্মা ছুঁলে রোগ সেরে যেত। রোদ উঠলে বরফ গলার মত তার ছোঁয়া লাগা মাত্র কঠিন কঠিন রোগ যেন গলে গলে পড়ে সেরে যায়। মল্লম্মাকে স্মরণ করলে বিপদ আপদ দূরে সরে যেত। বিয়ে করতে গররাজী হলেও তার মূর্খ বাবা এবং মা জোর করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করল। বিয়ের আগে তিন দিন তিন রাত্রি মল্লম্মা খুব কেঁদেছিল। ঐ তিন রাত্রি ঝড় বৃষ্টি হল। মল্লম্মার দুঃখই বৃষ্টির আকারে পড়ল। মল্লম্মা যে স্বয়ং দেবী দুর্গা তা যেন আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল। জটাধারী শিবের মাথা ঝাড়া দিয়ে রাগ প্রকাশের ফলেই হল ঝড় তুফান। শিবলিঙ্গের জল যে কুণ্ডে পড়ে ছিল তা ফুঁসে কেঁপে উঠল, বজ্রপাত হল। আকাশের বুক চিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল। নদীতে বাণ এলো। আর সেই বজ্রবিদ্যুতের আলোকে মল্লম্মার সেই আসল দেবীমূর্তি একবার দেখা দিয়েছিল। মল্লম্মা সেই আলোতে প্রার্থনা করে ছিল, 'প্রভু, আমি আসছি তোমার কাছে। আমাকে গ্রহণ করে এবার তুমি এই দেশটাকে বাঁচাও।' মল্লম্মার সেই কথা গুলো আকাশে বাতাসে, পাহাড়ে পর্বতে, ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত হয়ে সারা দেশে শোনা গিয়েছিল। তারপর মল্লম্মা নদীতে ঝাঁপ দিল। মুহূর্তে থেমে গেল ঝড়। বৃষ্টিও গেল থেমে। নদী যেন ক্লান্ত হয়ে নিস্তরঙ্গ হল। সকালে সবাই খোঁজা খুঁজি করল মল্লম্মাকে। মল্লম্মা নদীর যে ঘাটে চান করত সেই ঘাটের কাছে খুঁজল। নদীর জলে মল্লম্মাকে পেলনা, পেল তার পাথরের প্রতিমা। ঠিক মল্লম্মার রূপ রেখা ও উচ্চতা ছিল সেই পাথর প্রতিমার। যেখানে ঐ প্রতিমা ছিল সেখান থেকে জল সরে গেল। নদী অন্য বাঁক নিল। ক্রমে ঐ মল্লম্মার পাথর প্রতিমা রেখে লোকে গড়ে তুলল একটা মন্দির। মন্দিরের পাশে কি ভাবে যেন জল জমতে জমতে

একটা পুকুর হয়ে গেল। কারা যেন তোড় জোড় করে ঘাট তৈরির উদ্যোগ নিয়ে ছিল। তারপর থেকে কোন দিন ঐ গ্রাম ভাসানোর মত বন্যা হয়নি। অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টিও হয়নি কোনদিন। এই সবই মল্লম্মার দয়া বলে লোকের ধারনা।

মেথরদের তাড়ির নেশা বেশ জমেছে। ওরা গাইছে নাচছে। এক সারিতে দাঁড়িয়ে ছন্দ আর তাল মিলিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশজন নারী পুরুষ নাচছে। একটুও তাল ভঙ্গ হচ্ছে না। একজনের পাও নেশার ঘোরে টলছে না। আকাশে বাতাসে গানের মূর্চ্ছনায় মুখরিত আমেজ। একজনেরও বেসুরো গান হচ্ছে না। সবার কণ্ঠস্বর মিলে যেন একটি স্বর হয়ে উঠেছে। দর্শকরা চোখ ফেরাতে পারছে না। অবাক হয়ে হাঁ করে বড় বড় চোখে তাকিয়ে নাচ দেখছে। গান শুনে তাদের মন ভরে যাচ্ছে।

তারপর শুরু হল শশীরেখা পরিণয়ম নাটক। রাবি শশীরেখার চরিত্রে আর পাদ্দালু বলরামের চরিত্রে অভিনয় করবে। সাধু ভাষায় লেখা কবিতাবলী অজ পাড়াগাঁয়ের গরিব মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়ে যেন পবিত্র হয়ে উঠল। ওদের গলার জোর কত! এ পাড়ার গান শুনে ভিন্ পাড়ার লোক স্থির থাকতে পারতো না। গান ওদের টানতো। পালার শেষ অংশে শশীরেখার বিয়ে। তারপর একটা সমবেত গান আছে। 'ভারতবাকাম' সকলে মিলে গাইতে হয়। গান শুরু হওয়ার পর নটনটী ও দর্শকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সবাই গাইতে লাগল। পুল্লি ছোট দাওয়ায় বসে থাকা মাঙ্গাম্মাকে টেনে নিয়ে গেল মঞ্চের উপর। মাঙ্গিকে দেখে লিঙ্গরাজু আস্তে আস্তে উঠল মঞ্চে। তাকে সংযত করার জন্য ধর্মরাজু মঞ্চে উঠতেই গুমপু তাকে একবার নাচিয়ে নিল। তারপর মঞ্চের নির্ধারিত শিল্পীরা এক এক জনের নাম ধরে ধরে দর্শকদের ভেতর থেকে ডাকল। যাদের ডাকা হয় তাদের মঞ্চে উঠে আসতে হয়। এই নিয়ম। না আসা অভদ্রতা। রীতি বিরোধী কাজ! সেই রাত্রি ছোট বড় ও গরিব বড়লোকের ভেদ থাকেনা। ভেঙ্কাম্মা, পুন্নাইয়া, রঙ্গা, মল্লি, গঙ্গাম্মা, সকলের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল ঐ

মঞ্চ। মঞ্চের শিল্পীদের আর দর্শকদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল রাজু। সেও লোকের আগ্রহের আতিসহ্যে মঞ্চে না উঠে পারল না। ঐ দৃশ্য দেখে হাসি চাপতে পারল না লক্ষ্মী। হাসতে হাসতে তার পেটে খিল ধরে গেল। হাসতে হাসতে মুখে হাত চেপে লক্ষ্মী দোলনায় উঠে পড়ল। বিছানায় হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়ে বালিশে মুখ লুকোল। তারপর দোতলার বারান্দার এক কোনে বসে লক্ষ্মী দেখছিল আর হাসছিল। ও যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে মঞ্চের ও বাইরের অনেক কিছু দেখা যাচ্ছিল।

তারপর আস্তে আস্তে অঙ্গনের গান নাচ নাটক সব শেষ হয়ে গেল। সবাই চলে গেল। শিশির পড়ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শীত ক্রমশ জমে উঠছিল। লক্ষ্মী দোতলার বারান্দায় ঠায় বসেছিল। লক্ষ্মীর মনের অঙ্গনে তখনও নাচ গানের পালা চলছিল। সেই দৃশ্যগুলো তার চোখের পর্দা থেকে যেন কোনদিন সরবে না। দোতলার বারান্দায় কার্নিশ লতায় পাতায় সুন্দর ভাবে সাজানো। ঘন সবুজ আর নরম হাল্কা সবুজ পাতার মাঝে মাঝে সাদা ফুলের বাহার কার্নিশের শোভা অনবদ্য করে তুলছে। তার বিয়ের ব্যাপারে কারো চুপ চাপ বসে থাকার যেন উপায় নেই। সারা গাঁয়ের লোক নিজের নিজের বাড়ি সারাতে আরম্ভ করেদিল। গোটা পাড়া যেন একটা বাড়ি হয়ে গেছে। কেউ দেয়ালে গোবর মাটি লেপছে। আবার কেউ চাল ঠিক করে নিচ্ছে। পাকা বাড়ি যাদের তারা দেয়ালে চুন লাগিয়ে নিচ্ছে। মল্লম্মার মন্দিরের চারদিকে ভাল পাঁচিল তোলা হল। নানান রঙে রাঙানো হলো মন্দিরের দেয়াল। এমন রঙ লাগানো হল যার ওপর বৃষ্টির ছাঁট পড়লে গলবে। জ্বল জ্বল করছে দেয়ালের রঙ। অপরূপ রঙে প্রানবন্ত হয়ে উঠছে মন্দিরের রূপ। রঙ আবার অনেক জায়গা ঘুরে, খোঁজ খবর নিয়ে, শহর থেকে আনানো হচ্ছে। এনেছে স্বয়ং রঙ্গা আর লিঙ্গ রাজু। 'আহা, মন্দির কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ! কী খোলতাই হয়েছে মন্দিরের রূপ'! লোকে এই ধরনের কথা বলাবলি করতে লাগল। লোক জনের কথা শুনে আর মন্দিরের রূপ, নিজের চোখে দেখে, কেমন

যেন ভাল লেগেছিল গণাচারির। সে খুব দামী দামী কথা বলতে লাগল যেমন, 'উপনিষদের আলোকে বিচার করলে ভগবান নিরাকার নিগু'ণ। পুরাণের ঠাকুর দেবতাদের মানুষেরই মত লোভ ক্রোধ মদ মৎসার্য্য প্রভৃতি আছে। ওরা ভক্তদের কামনা বাসনা গুলো মেটাত। ওদের, তার জন্যই, লোকে পূজা করত। ছোট ছোট পাথর থেকে শুরু করে নানা আকারের দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। যে যার সংস্কার অনুযায়ী মানুষ নিজের নিজের ধ্যান ধারনা মত প্রতিমা, বা মূর্তি গড়ে নিল। কোন ঠাকুরের কোন্ গুণ তাও মানুষ প্রচার করতে লাগল। কিছু কিছু লোক আবার মানুষের মাঝেই দেবতাকে দর্শন করতে পারল। ওরাই নরনারায়ণ। আবার কয়েক জনের দেবতা সোনার অলঙ্কারের ভারে যেন নুয়ে পড়ছেন। মণি মুক্তা আর সোনার অলঙ্কারের মধ্যে দেবতার মূর্তিকে ঢেকে রেখেছে কিছু মানুষ।

দুই জমিদারের মধ্যে মিল আছে অনেক ব্যাপারে। অহঙ্কার, মানুষের উপকার করার কিছুটা সদিচ্ছা, গাঁয়ের লোক যাতে আমোদ প্রমোদ করতে পারে তার কিছুটা ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে মিল আছে। মন্দিরের চারদিকে, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, বেশ ভাল করে রঙ লাগানো সকলের তো পছন্দ হল। সবাই চেয়েছিল এই ধরনের একটা কাজ হোক। চায়নি শুধু রাজু। তার কাছে একাজের কোন মানে হয় না।

গণাচারির মতেও মল্লম্মা উপনিষদের কোন দেবী নন। তিনি সাজতে চান না! তিনি অতি সাধারণ গরিব ঘরের মেয়ে। তাঁর কোন অলঙ্কার নেই। তাঁর সম্পদ হল করুনা, ত্যাগ প্রভৃতি। গণাচারির মতে মল্লম্মা হল সেই গাঁয়ের মঙ্গল কামিনী, রক্ষা কারিনী। একবার বিশেষ প্রয়োজনে তিনি এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। যদি দেশের মঙ্গলার্থে, প্রয়োজন হয়, মল্লম্মা আবার আমাদের মত সাধারণ লোকের ঘরে জন্মাবেন। আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

মন্দিরের পেছনে বসে বাওয়াকে চিঠি লিখছে মল্লি। সে অনেক জরুরী কথা লিখছে ঐ চিঠিতে। বাওয়া বিষয়টা জানে। তবু বাওয়াকে ভাল ভাবে জানানো সে তার কর্তব্য মনে করে। গরুর বাচ্চা হয়েছে। সে

যা ভেবে ছিল তাই হয়েছে। বাছুরটা মন্দ। চিঠি লিখে পুরোন চিঠিগুলো যে খামে পুরে রেখেছিল সেই খামে পুরছে, এমন সময় গণাচারি ফুল তুলতে তুলতে মল্লির কাছে এল।

'কি গো মা, পড়তে আসছ না কেন?' গণাচারি জিজ্ঞেস করল।

'পড়াতো শিখে নিয়েছি।' মল্লি বলল।

'পড়তে শিখলেই তো আর হবেনা, লেখাও শেখা চাই।' মল্লি চোখ ছোট করে, মুখ টিপে, হাসল। মল্লির কোন কিছু দরকার হলে গণাচারির কাছে বলতে লজ্জা পায়না। আবার সে কিছু চায়ও না তার কাছে।

মল্লির কোন গোপন ব্যাপার গণাচারি জেনে গেলও সে লজ্জা পায়না। গণাচারি, মাঝে মাঝে, ছোট খাট ঠাট্টা করে। কিন্তু সেই ঠাট্টা মল্লি কোন দিন কানে তোলে না। মল্লি যে আবছা আলোতে বসে, ছোট ছোট কাগজে, তার বাওয়াকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখে তা গণাচারি জানে। ওসব চিরকুট যে রাজুর হাতে কোন দিন পড়বে না তাও গণাচারির অজানা নয়।

মল্লি নিজেই ছানা বানালো। গরুর দুধটা খুব গাঢ় হয়েছে। ঐ দুধের সঙ্গে সাধারণ দুধ আরো কত মেশালে ছানা হয় তা মল্লি ভাল ভাবেই জানে। তার বাওয়া ছানা খেয়ে খুব প্রশংসা করল। কিছুটা অন্য বাটিতে নিয়ে দৌড় দিল মল্লি। সে যে কোথায় যাচ্ছে তা রাজু অনুমান করতে পেরেছিল।

পায়রার মত উড়তে লাগল মল্লি। বহুবার হাঁটা পথ দিয়ে সে যেন আজ আর হাঁটতে চাইছে না। উড়ছে। লক্ষ্মীর বাড়িতে হাওয়ার মত সে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। লক্ষ্মী বসল ব্যালকনিতে। অঙ্গণ দেখছে লক্ষ্মী। নির্জন অঙ্গন।

'ছানা, সবে বিয়োন গরুর। ভাল হয়েছে, বলল বাওয়া।' মল্লি বাটিটা লক্ষ্মীকে দিতে দিতে বলল। লক্ষ্মীর চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। আবার মল্লির মুখে পুরে দিল ছোট চামচ দিয়ে কিছুটা ছানা।

'খাওয়াচ্ছতো খুব, তোমার কোথায়?' বলল লক্ষ্মী।

'আঃ, খাও তো।' বলল মল্লি।

দুজনেই একটু একটু করে খেল। চেখে চেখে, কেমন স্বাদ হয়েছে, বুঝে বুঝে খেল। মনে মনে ভাবতে লাগল, রাজুর কেমন লেগেছে না লেগেছে।

'দুজনে রাজযোটক হয়েছে। রাজু দাওয়া আর লক্ষ্মীদি।' ভাবল মল্লি।

'মল্লির জন্য একটা ভাল পাত্র দরকার। কিন্তু মল্লি শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে সে একা সব কাজ সামাল দেবে কি করে। রাজুরও তো ভাল লাগবেনা।' মনে মনে বলল লক্ষ্মী। নিজের অজান্তেই রাজু মল্লির প্রতি কত খানি আকৃস্ট, মল্লিকে সে যে কত স্নেহ করে, কত যে তার উপর নির্ভর করে তা লক্ষ্মী অনুভব করল। রাজু চান করতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিন তোয়ালে নিয়ে যেতে ভুলে যায়। লক্ষ্মী তা জানে। রাজুর হাঁক দিয়ে চাওয়ার আগেই মল্লি নিজের থেকেই তোয়ালে এনে কুয়োর উপর রেখে দেয়। রাজু ভাত খেতে বসে, প্রায় দিন অন্য মনস্ক থাকে। কেউ স্মরণ করিয়ে না দিলে কোন কোন বাটির তরকারী খাওয়াও ভুলে যায় আবার পেটে খিদে থাকলেও, না চেয়ে হাত ধুয়ে ফেলে। মল্লি কাছে থাকলে রাজুর ঠিক মত সব খাওয়া হয়। আবার ভাত নেয়। রাজুর পেটও ভরে। ক্ষেতে যাওয়ার আগে রাজুর পায়ের সামনে জুতো জোড়া এগিয়ে ধরে মল্লি। এর একটা কারণ আছে। রাত্রে রাজু ক্ষেতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরে যেখানে সেখানে জুতো জোড়া ফেলে রাখে। যে দিন কোন কারণে বেরুনোর সময় মল্লি বাড়ি থাকে না সেদিন রাজু জুতো খুঁজতে বাড়ি তোলপাড় করে ফেলে। সামনে থাকলেও রাজু যেন সব সময় দেখতে পায় না। এই সব ছোট খাট খবর, মাঝে মাঝে, সুযোগ পেলেই, মল্লি পুট পুট করে বলত লক্ষ্মীকে। তাই লক্ষ্মী বুঝতে পারে মল্লি এ বাড়িতে না থাকলে রাজুর কতখানি অসুবিধায় পড়তে হবে। আর রাজুর অসুবিধা মানেই তার অসুবিধা।

'দাওয়া ক্ষেতে যাবে হঠাৎ মাথায় বাঁধা কাপড় দেখতে না পেলে বাড়ি ময় তোলপাড় করবে। টুক করে এইকথা শুনিয়ে লক্ষ্মীর কাছ থেকে মল্লি এক দৌড়ে পালাল। রাজুর অভ্যাসগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে

অন্য মনস্ক ভাবে ঘরে ঢুকল মঙ্গী। জানালার উপর রাখা আছে নতুন ধান পোঁতা তালপাতার চুবড়ি। হাল্কা সবুজ রঙ নিয়ে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা শীষ। দেখে ইচ্ছে করল দুটো শীষ তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে রেখে চিবিয়ে দেখতে। চুবড়ির উপর ঝুয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ল সে। ভয় আর সঙ্কোচ তাকে যেন পেছনের দিকে টানল। কুঁজোর জল ঐ চুবড়িতে ছিটিয়ে দিল সে। তারপর ব্যাল-কনিতে গিয়ে বসল।

দীঘির ঘাটে ঘাটে রঙ বেরঙের তোরণ। কাগজ আর পাতা দিয়ে বানানো তোরণ। একটা ছোট নাগরদোলাও ঐ উৎসব উপলক্ষ্যে এনে বসিয়েছে দীঘির পেছনের বাগানে। পুতুলের দোকান এসেছে শহর থেকে। সুদূর দক্ষিণের শহর থেকে এসেছে রান্নার থালাবাসন হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি। মেলায় এসে লোক তাও কেনে। প্রত্যেকটা ঝক্ ঝক্ করছে। পট্ট বস্ত্রের দোকানও বসেছে কয়েকটা। নানা রকমের মিষ্টির আর তেলে ভাজার দোকানও বসেছে। পাকোড়া ও পিঠের ছাউনিও আছে এই মেলায়। সরবতের দোকান বসেছে কয়েকটা। আর আছে অসংখ্য দর্শণার্থী। আশে পাশের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ যেন ভেঙ্গে পড়েছে ঐ দীঘির আশে পাশে। রাখি বুড়তার হাত ধরে দোকানে দোকানে ঘোরাচ্ছে। তার পেছনে আঁটার মত লেগে আছে রঙ্গা ও লিঙ্গরাজু। অন্য দিকে মাঙ্গির সঙ্গে কোলুর বলদের মত কিছুক্ষণ ঘুরল ধর্মরাজু। উৎসব সঙ্কোচও লজ্জার বাঁধন শিথিল করে দেয়। মেলা বসলে ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ, মিলে মিশে ঘোরাঘুরি করতে পারে। একে অন্যকে ছুঁতে পারে। গায়ে গা লাগিয়ে চলতে পারে। ভিড়ের সুযোগে অপরিচিতাকেও ঠেলতে পারে। অনেক সুযোগ মেলায় মেলে। মেলায় ছোট জাত বড় জাতের বালাই থাকে না। ছুৎ অচ্ছুতের প্রশ্ন ওঠে না। রঙ্গার লীলা খেলার পক্ষে উপযুক্ত এবং নরম কোমল ক্ষেত্র যেন ছিল সেদিনের দীঘির কাছের মেলা।

রাখি ছোলার ডাল ভাজা কিনে বুড়তার হাতে দিল। ঝুয়ে ছাঁচ ঝাড়াইয়ের সময় হঠাৎ তার ঘাগরায় টান পড়ল।

'কি করছেন মশাই ?' বলে আরও কি যেন বলতে গেল পাশের গাঁ থেকে আসা সামনের ঘোড়ার দোকানদার। রঙ্গা কট্‌মট্‌ করে তাকাল তার দিকে। পাশের দোকানদার, কানে কানে কি যেন বলে, ঘোড়ার দোকানদারকে বারণ করল। রঙ্গা সম্পর্কে পাশের গাঁয়ের দোকানদার তেমন কিছু শোনেনি, জানে না। সব কিছুই চোখের পলকে ঘটে গেল। অল্প একটু পেট্রোল লেগেছে কি লাগেনি দপ্‌ করে জ্বলে উঠল ঘাগরা। গঙ্গাম্মা হঠাৎ এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘাগরার উপর। হাতে রগড়ে সে তৎক্ষনাৎ আগুন নিভিয়ে ফেলল। যেন নিজের শরীরের সমস্ত সত্তা দিয়ে নিভিয়ে ফেলল সে। ঘাগরার অনেকখানি জ্বলে গেল। রাবির দু পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল। গঙ্গাম্মার হাতে, বুকে, আগুনের ছ্যাঁকা লাগল। বাঁ গালেও কেন জানি ছ্যাঁকা লেগে গেল। সব চেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠল তার মুখ মণ্ডলের অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই, শক্ত হাতে, লাঠি উঁচিয়ে, সেখানে হাজির হল স্বয়ং পান্দালু।

'কোন্ হারামজাদা করেছে একাজ ? কার কম্ম এটা ?' চার দিক তাকাতে তাকাতে, চিৎকার করে, জিজ্ঞেস করল সে। তার চোখগুলো ঘুরতে ঘুরতে নিবদ্ধ হল রঙ্গার ওপর। রঙ্গার চোখে মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। কেউ বলল না এই অপকর্ম কার, কে ধরিয়েছে রাবির ঘাগরায় আগুন। পান্দালু রঙ্গার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে ঝট্‌ করে চলে গেল।

'বানচোৎ মেথরের বাচ্চার কি রকম দেমাগ !' বলল রঙ্গা পান্দালুর চলে যাওয়ার পর।

মন্দিরে পূজো হচ্ছে। বড় কাপু দু'জনেই একটা করে বলি দিল মায়ের কাছে। পাঁঠাদের গায়ে হলুদ আর কুমকুম লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর গা গুলিয়ে উঠল। মল্লি কিন্তু উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল পাঁঠাদের দিকে। রাজুর মল্লম্মা দেবীর প্রতি অত ভক্তি নেই, অশ্রদ্ধাও নেই। অন্যান্য উৎসবের মতই এটাও তার কাছে একটা উৎসব। রাজুর কাছে তার বেশি কিছু নয়। অতএব, এর গুরুত্ব মল্লির কাছেও তত

নয়। বলিও রাজুর কাছে তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়। প্রত্যেক দিনই তো বলি হয়। কেউ না কেউ দেয়। মাংস তো বাড়িতে খেতেই হয়। তা সে পাঁঠারই হোক অথবা মুরগির। হত্যা না করে মাংস হবেই বা কি করে? এই বলিও রাজুর কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মল্লির কাছেও এর কোন গুরুত্ব নেই। একটি ঘটনা মাত্র।

বলি দেবার পর পাঁঠার রক্ত মনসা দেবীর সামনে রাখল গণাচারি। হাত জোড় করে তন্ময় হয়ে প্রার্থনা করছে সে। সুব্বাইয়া কাপু ও রাওয়াইয়া কাপু নিজেদের মধ্যে মজার মজার কথা বলে হাসাহাসি করছিল।

এই উৎসবের জায়গায় ধর্মরাজু ভীষণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে। রাবির খাগরায় আগুন লাগা, পাদ্দালুর লাঠি হাতে রঙ্গার দিকে রক্ত চক্ষুতে তাকানো ও চার দিক তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়া, 'রঙ্গার এই ঘটনার একটা প্রতিকার হওয়া উচিত,' বলে চার জনের কাছে বলা প্রভৃতি ঘটনার পর তার মাথায় যেন অনেক কাজের বোঝা চেপে গেল। ইতিমধ্যেই সে মন্দিরের পেছনে গিয়ে নাগর দোলার কাছে ভেঙ্কান্নার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছে।

'আজ রাত্রের মধ্যে ঐ হারামজাদা রঙ্গার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব বলে প্রকাশ্যে লোকজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রচার করেছে ঐ ঘাটের মড়া মেথরের বাচ্চাটা! কী দিনকাল পড়েছে রে ভেঙ্কান্না! তাই বলছি, সন্ধ্যের আগে আমরা যদি ঐ মড়াটার ঠ্যাং খোঁড়া করতে না পারি তাহলে তো ইজ্জত নিয়ে আমাদের আর বাঁচা যাবে না ভেঙ্কান্না!'

বড় কাপু দুজন জানে না, কি নিয়ে, এত কানাকানি হচ্ছে। ওদের অজান্তেই তুষাগুন জ্বলছে। রাজুর কানেও পৌঁছায়নি কোন খবর। পুন্নাইয়া বুঝতে পারছে না কিসের জন্য এত গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ চলছে। কি জানি, কি হবে, ভেবে কেউ তত গুরুত্ব দিল না ঐ ফিস্ ফিসানিতে।

লম্বা দুটো সারিতে গাঁয়ের লোক দাঁড়ালো মন্দিরের সামনে

প্রত্যেকের হাতে নতুন ধানের গাছ গজিয়ে ওঠা চুবড়ি। সামনের সারির প্রথমেই দাঁড়াল লক্ষী আর রাজু। এক একজন মন্দিরের উপর চুবড়ি ছুঁড়ে দেয়। উপরে দাঁড়িয়ে লোকে ঐ চুবড়ি লুফে নেয়। মন্দিরের উপর সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখবে ঐ চুবড়িগুলো। একের পাশে অন্য। বড় বড় পরিবারের চুবড়িগুলো কোথায় থাকবে সে জায়গা, যুগ যুগ ধরে ঠিক করা আছে। মল্লম্মা যেহেতু মেথরের মেয়ে অতএব একমাত্র মেথররাই মন্দিরের উপর উঠতে পারে। এটাই রীতি। বহু বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি। পান্দালু এক দিক দিয়ে মন্দিরে ওঠার সময় অন্য দিক দিয়ে রঙ্গা উঠে পড়ল মন্দিরের উপর।

'ওরে এই, কি করছিস?' বলল রাওয়াইয়া।

'কিছু হবে না বাওয়া। একটা মেথর, পান্দালুতো উঠেছে। নিয়ম রক্ষা হল। দিন বদলের পালা চলেছে। সবই বদলাচ্ছে। এটাইবা বাকি থাকে কেন?' বলল ধর্মরাজু। গণাচারি ঐ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে কেনো কথা বলল না। এক একটা আচার বিচার পুরোপুরি মানলেও কোন কোন আচার বিচারের যে মানে হয় না, তা সেও বিশ্বাস করে।

মল্লম্মা মেথর কন্যা হলেও সমস্ত জাতের লোকই তাঁকে পূজো করে। অতএব, মেথরদের কোন ব্যাপারে বেশি অধিকার দিলে, মনে হয় যেন, মল্লম্মা ওদেরই দেবী। মল্লম্মার এও এক সীমা রেখা টানার মত। কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা। গণাচারি নিজে ঐ সব বাধা নিষেধের বাঁধন ছিঁড়তে চায় না, তবে কেউ কোন নিয়ম ভাঙ্গলে বাধা দিতে তার ইচ্ছে করে না। তাতে কোন আপত্তিও থাকে না। আচার বিচারের বোঝা কমুক এটা সে চায় তবে নিজে কমাতে সাহস পায় না। পাছে কোন ভক্ত ক্ষেপে যায়—এই ভয়ে বলল গণাচারি :

'করণম্ মশাই সত্যি কথাই বলেছেন।' রঙ্গাকে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে। ওর ভাল লাগছে উঠতে। 'ছেলেদের পূজো পাঠে মন বসলেই ভাল। মনই আসল। নিয়ম কানুন, অদল বদল হলে, দোষের কি আছে?' রাওয়াইয়া বলল।

রাজুর ছুঁড়ে দেওয়া চুবড়ি পান্দালু ধরল। আর লক্ষীর ছোঁড়া চুবড়ি লুফে নিল রঙ্গা। দুজনে দুটো চুবড়ি নিয়ে মন্দিরের পেছনের দিকে চলে গেল। তাই মন্দিরের উপর ঐ দুটো চুবড়ি রাখার সময় কি হচ্ছিল না হচ্ছিল তা নিচের কেউ জানে না। একটা চুবড়ি উড়ে এসে নিচে পড়ল। চুবড়ি ভেঙ্গে গেল। সকলের বুক ধক্ ধক্ করে উঠল। এই ভাবে চুবড়ি নিচে পড়ে যাওয়াটা অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। ঐ চুবড়ির দিকে তাকিয়ে লোকে বুঝতে পারল কি ভাবে রঙ্গা পান্দালুর উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। রাওয়াইয়া প্রথম দেখতে পেল রঙ্গার গালে পান্দালুকে টেনে চড় কষতে।

'আমার মালিকের চুবড়ি নিচে ফেলে দিল?' পান্দালু চিৎকার করে উঠল।

'আমার চুবড়ি রাখার জায়গায় তুমি কেন তোমার চুবড়ি রাখছ?' বলে রঙ্গা পাগলের মত পান্দালুকে ঘুষি মারতে লাগল। ভেঙ্কায়া, পুন্নাইয়া দুজন দুদিক থেকে উপরে উঠল। পুন্নাইয়া দুজনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করার সময় রঙ্গার ঘুষি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে লাগল তার কানের উপর। পুন্নাইয়া রাগ চাপতে না পেরে রঙ্গার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেঙ্কায়া লাঠি দিয়ে পান্দালুর মাথা ফাটাতে গিয়ে ছিল। ওর হাত থেকে, জোর করে, লাঠি কেড়ে নিতে গেল পান্দালু। পর মুহূর্তে ছিটকে নিচে পড়ে গেল ভেঙ্কায়া। রাজু এবং আরও চারজন তাকে হঠাৎ ধরে না ফেললে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে যেত। কিন্তু কারো বাধা না মেনে, সবাইকে ঠেলে ফেলে দিতে দিতে এগিয়ে গিয়ে আবার ছাদে উঠল ভেঙ্কায়া। রাজুও অন্য দিক থেকে উঠল। লক্ষীর বুক ভয়ে কাঁপতে লাগল।

'এর এত দেমাগ হয়ে গেছে!' বলল রাওয়াইয়া।

'রঙ্গার মত গুণ্ডাকে কে উঠতে দিল মন্দিরের ছাদে?' বলল সুব্বাইয়া। পবিত্র চুবড়িকে রঙ্গার নিচে ফেলে দেওয়ার অপরাধকে সে কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে না। ধর্মরাজু লোকজনের হাত থেকে চুবড়ি নিয়ে নিচে রাখল। একা রাজুর পক্ষে সম্ভব নয় ছাদের উপর অতজনের ঝগড়া মেটানো। অদূরে, দেখা গেল, তিরিশ চল্লিশ জন

চাষী-জিন মজুর লাঠি হাতে, সবাইকে ঠেলতে ঠেলতে, মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসতে। যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের ওরা মারছিল। যারা মার খাচ্ছে তারা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ছে। মেয়েদের দিকেও ঝগড়াটা ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসতে রাজু নিচে নাবল। সুব্বাইয়া ও রাওয়াইয়া গলা উঁচু করে চেঁচাতে লাগল। বড় কাপুদের গলা ঐ হৈ চৈ আর গণ্ডগোলের মধ্যে ডুবে গেল। ক্ষীণ হয়ে গেল তাদের কণ্ঠস্বর। ধর্মরাজুর কথা রাওয়াইয়ার কানে ঢুকল।

'দেখতো বাওয়া, কত বছর ধরে চলছে এসব। সুব্বাইয়া কাপুর একটুও যদি বুদ্ধি থাকত! গোল মাল কোথায় থামাবেন তা নয় রঙ্গাকে মেরে ফেলতে বলছে।' বলল ধর্মরাজু। লোকের কোলাহল হৈ চৈ ধাক্কা ধাক্কির মধ্যে সুব্বাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করল রাওয়াইয়া। ধর্মরাজু যে অনুযোগ করেছিল সে কথা গুলো সে শুনতে পেল সুব্বাইয়াকে বলতে।

ঝগড়া মেয়েদের আর বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। লোকের দম বন্ধ হয়ে আসছে ঐ সরু পরিসরের আবহাওয়ায়। রাজু ঐ জন প্রবাহের বিপরীত দিকে এগোতে এগোতে লক্ষ্মীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তার চেষ্টা সত্ত্বেও লক্ষ্মী ও রাজু পরস্পর থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। এমন অবস্থায় মল্লিকে লক্ষ্মীর কাছে যেতে দেখে রাজু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

সেদিন পর্যন্ত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে পুলিশের ডাক পড়েনি ঐ গ্রামে। মেলায় যাতে ছোট খাট চুরি চামারি না হয় শুধু তা দেখার জন্য দুজন পুলিশ ঘুরে যেতে এসেছিল। সেই মুহূর্তে শহরে খবর পাঠিয়ে পুলিশ বাহিনী আনানো সম্ভব নয়। ঐ দুজনের মধ্যে একজন পুলিশ, কিছুটা বুদ্ধিমান, বন্দুক নিয়ে মন্দিরের উপর উঠল। একবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। লোকের জটলা ধাক্কা ধাক্কি কিছুটা কমল। তারপর মন্দিরের উপর পরস্পরকে জড়াজড়ি করে যারা মারামারি করছিল সেই পাদ্দালু, পুন্নাইয়া, রঙ্গা ও ভেঙ্কান্নাকে উদ্দেশ্য

করে বলল, 'থামো! না হলে গুলি চালাব!' বলল ঐ পুলিশ। পল্লী গ্রামের লোক বন্দুকের গুলিকে ভীষণ ভয় করে। চার জনই সুড় সুড় করে নিচে নেমে গেল।

'এখানে একটা পাখিও থাকতে পারবে না। সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।' বলল পুলিশটি। রাওয়াইয়া, সুব্বাইয়া রাগে একে অন্যের দিকে তাকালো। কি যেন বলতে গেল। রাজু বলল, 'বাবা, বাড়ি ফিরে চল।' বড় কাপু দুজনেই যে যার বাড়ির দিকে ফিরে গেল। অতগুলো মানুষের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের মত দেখাচ্ছে ঐ জায়গাটাকে।

মন্দিরের কাছে পড়েছিল অনেক গুলো ধানের চারা গজানো চুবড়ি। দোকান গুলো কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। কোন দোকানে লোক আছে আবার কোন দোকানে দোকানদারও নেই। ঐ কুরুক্ষেত্রটাকে দেখতে পারল না গণাচারি। চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। ঐ অশ্রুসজল চোখে মন্দিরের মল্লম্মার মূর্তির দিকে তাকিয়ে নিজের হৃদয়ের কথা নিবেদন করল।

সন্ধ্যে নাগাদ গ্রামে পৌঁছে গেল এক সাব-ইন্সপেক্টর। সে পঞ্চাশজন পুলিশের একটা বাহিনী নিয়ে এল। রাওয়াইয়ার বাড়িতে গেল এস, আই। এই মারামারি রাওয়াইয়ার কাছে খুব অপমান জনক লাগল। দশ গাঁয়ের লোক তাকে এক ডাকে চেনে অথচ সে নিজের গ্রামের ঝগড়া থামাতে পারল না। শেষে কি না একটা পুলিশ তাকেও বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম করল আর তাকে সেই হুকুম মাথা নিচু করে তামিল করতে হল। ক্রমশ তার মনে গাঁয়ের উপর, পুলিশের উপর রাগ বাড়তে লাগল। তার মনে রাগ গোমরাতে লাগল।

'রাওয়াইয়া গারু, (তেলুগুতে গারু শব্দের অর্থ মহাশয়) এতদিন আপনারা দুজনে গ্রামটাকে, বলা চলে ইচ্ছেমত পরিচালনা করছিলেন। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন তাহলে গ্রামেরই অপকার হবে। ঝগড়ার কোন কারণ থাকলে এক জায়গায় বসে মিটিয়ে নিলেই ভাল আর তা না হলে বুঝতেই তো পারছেন সমস্ত ব্যাপারটাকে

আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে। কারণ ঝগড়াঝাটি রক্তারক্তি কোন ক্রমেই সহ্য করা যায় না।' বলল এস. আই।

কথাগুলো রাওয়াইয়ার কাছে আলাপ আলোচনার মত লাগল না। মনে হল তাকে যেন হুকুম করা হচ্ছে। সেই গ্রামে বিনা বাধায় সে এত দিন দাপট চালিয়ে এসেছে। বিরাট বড় একটা অধিকারীর মত এসে তার মত লোককে এসব কথা শোনানোর কি অর্থ হতে পারে। এতো পরোক্ষে তাকে ভয় দেখানো। রাওয়াইয়ার কিছু বলার আগেই ভেঙ্কায়া ফোঁস করে উঠে বলল, 'ক্ষমতা থাকলে, ঐ পাদ্দালু আর পুন্নাইয়াকে ধরে হাতে হাত কড়া পরিয়ে নিয়ে যান। আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের উপরেই চোট পাট দেখায়। এত বড় সাহস তাদের?'

ইন্সপেক্টর মনে মনে হেসে বলল, 'অ্যারেষ্ট করার কথাই যদি বল তো তাদের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আর তোমার ভাইকেও অ্যারেষ্ট করতে হবে। বুঝলে?'

'কী বকছ আবোল তাবোল?' চিৎকার করে বলল রঙ্গা।

ইন্সপেক্টর আবার হাল্কা মেজাজে হাসল। 'আপনাদের রাগটাগ একটু কমলে পরে আবার এসে দেখা করব। তবে একটা কথা, আবার যদি কোন গোলমাল দেখা দেয় তাহলে যাকে সন্দেহ হবে তাকেই ধরে নিয়ে যাব। আশা করি, সে রকম অবস্থা যাতে না হয় তার চেষ্টা করবেন।'

ইন্সপেক্টর চলে গেল। ঐ বাড়িতে এর আগে কোন সরকারী লোক পা রেখে এই ধরনের কথা বলে যায়নি। রাওয়াইয়া যাকে যা বলেছে সে তাই বিশ্বাস করে মাথা নেড়ে চলে গেছে। কোন কথা বলার সাহস করেনি। কোন রকম প্রশ্ন করেনি। কোন সন্দেহ করেনি। তবে এই ঘটনার মধ্যে কতটা যে কোন্‌টা সত্য, আর তার যে এমন অবস্থায় কি বলা উচিত তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। শেষে সরকারের উপর, লোকের উপর সুব্বাইয়া কাপুর রাগ দানা বাঁধতে লাগল। সমস্ত মন ভরে গেলো প্রচণ্ড রাগে। আসলে মন্দিরের ছাদে কি ভাবে যে কি ঘটে গেল, কেন যে ঘটল, এই ঘটনার পেছনে যে কোন্‌ কারণটা আছে

তার কিছুই সে জানে না। কোত্থেকে কি ঝট্ করে ঘটে গেল। পুলিশ এসে গেল। আর যা কোন দিন ঘটেনি তাই আজ ঘটে গেল। বলে কি না সন্দেহজনকদের খবর। ট্রাক্টর আনার পর সুব্বাইয়া কাপু যে সব দিন মজুরদের ছাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের নিয়ে ধর্মরাজু যে কদিন ধরে জোট পাকিয়ে ছিল তা রাওয়াইয়া ভাল ভাবেই জানে। এ ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা তার নিজের ছেলে রঙ্গারও থাকতে পারে বলে তার ধারণা। যা ঘটে, গোপনে ঘটুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ওরা, ঐ লাঠি হাতে ছুটে আসা লোকগুলো যখন 'রাওয়াইয়ার জয়' বলে চিৎকার করল তখনই সব মাটি করে দিল। সবাই জেনে গেল যে ওরা রাওয়াইয়ার পক্ষে। ঐ ভাবে চিৎকার করাতেই যেন নেপথ্য কাহিনী সব মুহূর্তে ধরা পড়ল। ব্যাপারটা সুব্বাইয়া নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে। তা না হলে যদিও তার কথা কেউ শুনতে পায়নি, তবু সে ওভাবে চিৎকার করে বলল কেন, 'রাওয়াইয়া কাপুর খুঁটির জোরে তোমরা…' তার পরের কথাগুলো আর শোনা গেল না। ডুবে গেল ঐ গোল মালের মধ্যে। সুব্বাইয়ার ওভাবে চিৎকার করার আগে তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলেই পারত। সে নিজেই বলে দিত। তা না অতগুলো লোকের মধ্যে ওভাবে চিৎকার করে বলাতে কি লাভ হল তার! লোকে কি ভাবল! সে কি জানে না সে কি রকম লোক। না কি ভেবেছে ঐ ভাবে একবার চিৎকার করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে?

ধর্মরাজু মাঙ্গির কথা ভুলে গেল। তার বুদ্ধি যেন শান দেওয়া বঁটি। যত বড় কুমড়ো কাটতে পারে বঁটির তত বাড়ে আনন্দ। এই গ্রামে এর আগে সে কোন দিন বুদ্ধি খেলানোর এত বড় সুযোগ পায়নি।

তবে সারা গাঁয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করার অথবা দুটো পরিবারের মধ্যে বড় ধরণের ঝগড়া লাগানোর কোন ইচ্ছা আছে কি না জানা যায় না। কোন সুস্পষ্ট কারণ নেই তার পেছনে। দুটো পরিবারের মিল না হলে তো তার কোন লাভ নেই। অন্তত তার মনে ঐ ধরনের কোন

চিন্তা নেই বলেই মনে হয়। শেষ পর্যন্ত রাজু লক্ষ্মীকে বিয়ে করেই ছাড়বে। অতএব আর কোন গোলমাল বাড়িয়ে কাজ নেই। তবু অতবড় দুটো পরিবারের ছেলে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে আর তার মাঝে কোন ঝামেলা দেখা দেবে না—এ যেন ধর্মরাজুর কাছে অসহ্য। ধর্মরাজু, যে উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করে, তার সঙ্গে তার কথার কোন সঙ্গতি থাকে না। থাকে বলে সে নিজেও জানে না। মনের গভীরে যে রাগ চাপা থাকে তা তার চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথা গুলো গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে কিছুটা ধরা যায়।

ধর্মরাজু একটা মহৎ উদ্দেশ্যে সুব্বাইয়া কাপুর বাড়ি গিয়েছিল। বড়দের শত্রুতার ফলে যুবকদের জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে এটা সে চায় না। এই দুটো পরিবার মিলে মিশে থাকলে যে গাঁয়ের পক্ষে মঙ্গল তা ধর্মরাজু ভাল ভাবেই জানে। বাড়িতে যেতেই প্রথমেই সামনে পড়ে গেল রাজু।

'কী করণম্ মশাই, এর পরের ব্যাপারটা ট্রাক্টর নিয়ে হোক। যে সব দিন-মজুর আছে তাদের রাওয়াইয়া মশাই চাকরি দেবেন না ওদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেন সেটাই দেখা বাকি আছে।

ধর্মরাজু বলতে যাচ্ছিল, 'রাওয়াইয়া বাওয়ার সঙ্গে ও সবের কোন সম্পর্ক নেই,' কিন্তু তা না বলে সে বলল, 'তা নয় রাজু, হঠাৎ ওদের চাকরি গেছে তো! পেটের জ্বালা বড় জ্বালা তো…'

'সেই জন্যই বুঝি, মামা (মামা ও শ্বশুরকে তেলুগু ভাষায় মামা বলা হয়) আমাদের চোখের জল ফেলিয়েছেন। আমাদের চোখের জল না দেখে তাঁর শান্তি হচ্ছিল না।' রাজু বলল।

'আসলে এ সব ঐ হারামজাদা পাদ্দালুর রঙ্গার উপর হাত তোলার ফলেই হয়েছে।' ধর্মরাজু বলল।

'সে যা করেছে আমি হলে তক্ষুনি মা কালীর কাছে বলি দিতাম। আমার চুবড়িটাকে একেবারে নিচে ফেলে দেওয়া!' ভীষণ রেগে গিয়ে রাজু বলল।

ধর্মরাজু রাওয়াইয়া কাপুর বাড়িতে গেল।

'বাওয়া, ঐ রাম্বু, পুন্নাইয়া মিলে আমাদের বাপ চোদ্দ পুরুষ তুলে তুলো ধুনো দিচ্ছে। আমি আর নিজের কানে শুনতে পারলাম না। রঙ্গাকে মন্দিরের ছাদে তুলে তুমিই নাকি ওর চুবড়িটা ফেলিয়ে দিয়েছ। ওরা যে সব-দিন মজুর চাষীদের কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে তুমি নাকি তাদের সবাইকে জড় করেছ। তাদের নাকি তাড়ি খাইয়েছ। তাদের নাকি তাতিয়ে ঐ রাম্বুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছ। এ সব কথা শুনে ভাবলাম যাক রাম্বু ছেলে মানুষ রাগের মাথায় যা মুখে আসছে তাই বলছে। গেলাম সুব্বাইয়া কাপুর কাছে। বললাম, 'তুমি আর আমার বাওয়া আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছ। এই ধরনের ঝগড়া দুজনের পক্ষেই অমঙ্গলের। একবার আমার বাওয়ার কাছে এসে কথা বল। তোমরা গাঁয়ের মাথা। তোমরা চার জনের ঝগড়ার বিচার কর। আর আজ তোমরা যদি নিজেদের ঝগড়া, বসে কথা বলে, মিটিয়ে না নাও তা হলে কে আসবে তোমাদের ঝগড়া মেটাতে এই ধরণের কত কথা পাখিকে পড়ানোর মত বললাম। কিন্তু হায়। যা শুনেছিলাম ছেলের মুখে, প্রায় সেই কথাই বলে গেলেন বাবু। অধিকন্তু উনি মেজাজ দেখিয়ে বললেন, তুমি ভেবেছ, তোমার বাওয়ার পায়ে না পড়লে আমার চলবে না? যাও, যাও এখানে থেকে। দালালি করার আর জায়গা পাওনি? এখানে চালাকি মারাতে এসেছ? —কি করব শুনতে হল এসব কথা। ফিরে এলাম মাথা নিচু করে।'

'তাহলে কি বাবা গিয়ে তার পায়ে পড়বে?' বলল ভেঙ্কাম্মা।

'না, ব্যাপার হল আমাদের বাড়ির মেয়েকে ওদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিতো…' ধর্মরাজু বলল।

'তার জন্যে কি বাবাকে মাথা হেঁট করতে হবে? মান সম্মান খুইয়ে ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে? কেন, আমার বোনের কপালে কি দেশে আর পাত্র জুটবে না? ঐ একমাত্র যোগ্য পাত্র আছে নাকি দেশে?' বলল রঙ্গা।

'তুই চুপ করবি!' রাওয়াইয়া ধমক দিয়ে বলল।

ধমক দিলেও মেয়ের বিয়ে দেবে বলে মাথা হেঁট করতে কোন ক্রমেই

রাজী নয়। ঝগড়ার পর তার মনে এই প্রশ্ন একবার জেগে ছিল। কিন্তু তেমন দানা বাঁধতে দেয়নি। এতক্ষণ এই ধরণের কথা কেউ প্রকাশ্যে তোলে নি রঙ্গার মুখে কথাটা শুনে এক দিক দিয়ে তার ভালই লেগেছে।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব কথা শুনছিল লক্ষ্মী। তায়ের কথা শুনে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। অন্ধের মত ছুটে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। চোখ তার জলে ভরে গেল। অতি পরিচিত সিঁড়িগুলো তার কাছে কেমন ঝাপসা লাগছে। সব যেন সমান হয়ে গেছে। দোতলায় উঠতে তার পা যেন আর পারছে না। অবশ হয়ে আসছে। নিজের ঘরে কোন রকমে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিল। অলিন্দে বসে দুটো রডের মাঝে মাথা রাখল। শিশির ভেজা জায়ফলের গাছ থেকে চমৎকার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। রাত্রে যে শিশির পড়েছিল তা এখন উবে যায়নি রোদে। জায়ফলের গাছ থেকে পাতা ঝরে। শব্দহীন পাতা ঝরার সঙ্গে লক্ষ্মীর এই মুহূর্তে চোখের জল ঝরার তুলনা করা যেতে পারে। পাতা ঝরে যায় ক্লান্তিহীন। মেয়েদের চোখের জল আর গাছের পাতা ঝরে রাতদিন। পাতা ঝরার শব্দ লক্ষ্মীর মনের সঙ্গে তাল দিয়ে বিলাপের মত ভেসে আসে। তার মনের ভেতরটা কেমন শিশির বিন্দুর মত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মেয়েকে দোতলায় পাগলের মত ছুটে যেতে দেখতে পেল সুরালু। মেয়ের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় তার গলার কাছটায় কেমন যেন দলা পাকিয়ে উঠল। দাওয়ায় এসে বলল, 'তোমাদের জেদ আর দেমাগ দেখাতে কি মেয়ের গলায় কলসি বেঁধে জলে ডোবাতে চাও? অ্যাঁ?'

'যাও তো, যাও, ভেতরে যাও, এখানে জ্ঞানের কথা বলতে এসেছে। যাও ভেতরে।' বলল রাওয়াইয়া। বলল বটে কিন্তু বউ যে ব্যথা অনুভব করছে মেয়ের জন্য তার মনেও তার কিছুটা আছে। সেও বোঝে লক্ষ্মী মনে মনে রাজুর প্রতি কতখানি এগিয়ে গেছে। তাই বলে সুব্বাইয়ার কাছে গিয়ে সে কি বলবে। আর যাবেই বা কেন? কি তার অপরাধ? মিটমাটের পক্ষে ধর্মরাজু ঠিক উপযুক্ত লোক নয়। তবে

কোন ব্যাপার খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে যোগ্য লোক আর নেই। কি যেন ভেবে মনে মনে কোমরে গামছা বেঁধে যাওয়ার জন্ত উঠে দাঁড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজু তার পিছু নিল। কিন্তু রাওয়াইয়া তাকে তার সঙ্গে যেতে বারণ করল।

মল্লম্মার মন্দিরের এক কোনে বসে গণাচারির মাধ্যমে সুব্বাইয়াকে ডেকে পাঠাল সে। সুব্বাইয়া এল। রাওয়াইয়া সুব্বাইয়া একে অন্তের দিকে তাকাল। কে যে আগে কথা বলবে আর কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে গণাচারি দুজনের উদ্দেশ্যেই বলল, 'আপনারা দুজনেই গাঁয়ের অধিকারী। কে যে অপরাধী আর কে যে অপরাধী নয় তা একমাত্র মল্লম্মাই জানেন। ঝগড়া বিবাদ থাকলে অপর পক্ষের দোষটাই বড় করে চোখে পড়ে। সব কিছু ভুলে মায়ের উৎসব আবার শুরু করান। বিয়ের শুভ কাজে আর বিলম্ব করবেন না। ভুল ত্রুটি যা হয়েছে তা মা মল্লম্মাই ক্ষমা করবেন।'

'সে কথা ভেবেই তো আমি খবর পাঠালাম।' বলল রাওয়াইয়া।

'আমি কি বুঝিনি সে কথা? আমি কি তোমার ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আসিনি? আসব না বলে তো কোন জিদ ধরিনি।' বলল সুব্বাইয়া।

গণাচারির মনে কিছুটা আনন্দ হল। কিছুক্ষণ আবার দুজনেই নীরব। কারো মুখে কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে সুব্বাইয়া বলল, 'বাওয়া, বিয়ের দিনক্ষন ঠিক করা ভাল। যত তাড়াতাড়ি ঠিক হয় ততই মঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' বলল রাওয়াইয়া।

বিরাট এক বোঝা যেন নেমে গেল। একে অন্তের হাত ধরে ভুল বোঝা বুঝির জন্য পরস্পরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার ভঙ্গী করতে যাচ্চে এমন সময় এল পাদ্দালু। তার মাথায় ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

'ভেঙ্কটেশ ও আরও দশ জন লোক আমাদের গাদা থেকে ফসল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিতে গেলে ধাক্কাধাক্কি মারামারি হয়ে গেল।' বলল পাদ্দালু।

'দিন দুপুরে গাদা থেকে মাল নিয়ে যেতে এসেছে! এতখানি সাহস পায় কোত্থেকে?' সুব্বাইয়া বলল।

'সেটা আবার খাটে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে দেখছিল ভেঙ্কান্না কাপু, রজ্জা কাপু।' বলল পাদ্দালু।

'তুমি কি বলতে চাও যে ওরাই করিয়েছে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল রাওয়াইয়া।

'বারণ করা উচিত ছিল তো! আমাদের লোক গিয়ে তোমাদের গাদা থেকে মাল তুলে আনলে তুমি চুপ করবে!' বলল সুব্বাইয়া।

'তুমি যাদের পেটে মেরেছ তারাই তোমার গাদায় হাত বাড়াচ্ছে।' বলল রাওয়াইয়া।

'এই ইতরামির মধ্যে তাহলে তোমার হাত আছে। বলল সুব্বাইয়া।

রাওয়াইয়া ঝট্ করে উঠে চলে গেল। গণাচারি মৌন ভাবে মল্লস্মার দিকে তাকাল। 'ভেঙ্কটেশকে ধরা গেল না। পেণ্টাইয়াকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।' বলল পাদ্দালু।

সুব্বাইয়া কাপু পাদ্দালুকে নিয়ে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল।

যেখানে গাদা ছিল, চুরি করার জন্য ভেঙ্কটেশ প্রভৃতি এসেছিল সেখানে পুলিশ আর ইন্সপেক্টর রয়েছে। ধরা পড়েছে পেণ্টাইয়া। সে বলছিল যে সে কিছুই জানে না। দেখেনি। সে বেচারা একা কোন দিকে না তাকিয়ে খাটের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। হটাং তাকে ঝাপটে ধরে মারা হয়। রাজু কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাং ঠাস করে তাকে একটা চড় মারল।

'এই যে স্যার, আসামী আমাদের হেফাজতে আছে। তার গায়ে হাত তোলার আপনার কোন অধিকার নেই।' বলল ইন্সপেক্টর।

'না মারলে ও কি সত্য কথা বলবে?' সুব্বাইয়া বলল।

'সেটা আইন বিরুদ্ধ।' বলল ইন্সপেক্টর।

'অইন না ছাই। গাদা থেকে মাল নিয়ে পালানোর সময় আপনাদের আইন কোথায় ছিল?' সুব্বাইয়া বলল।

'আপনারা লিখিত অভিযোগ করুন, জানান কি কি হয়েছে। আমরা কেস নেব।' বলল ইন্সপেক্টর।

'কেস করে আমরা যদি শহরে পড়ে থাকি তাহলে আমাদের ঘর

বাড়ি ক্ষেত খামার দেখবে কে ? আমরা কোন কেস করতে যাচ্ছি না। আপনারা করতে পারেন।' বলে সুব্বাইয়া হন্ হন্ করে চলে গেল।

দীঘির ঘাটে দাঁড়ালো রাজু। অদূরে আছে এক তেঁতুল গাছ। সেই গাছের নিচে ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী। এর আগে প্রত্যেক দিন রাণীর মত, ক্ষেতের উপর দিয়ে, দুলতে দুলতে, হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্মী এসেছে। এর মাঝে কদিন আসা বন্ধ করে দিয়েছিল সে। আজও ক্ষেতের গাছগুলো হাওয়ায় দোলায় সময় মনে হয় যেন লক্ষ্মী আসছে। তেঁতুল বেত চালাতে চালাতে চারা গাছ গুলোকে যেন পোষ মানাতে মানাতে হাঁটতো! মাঝে মাঝে একটা খেজুর পাতা ভেঙে নিয়ে তা দিয়ে চাঁটি মারতে মারতে এগিয়ে আসতো রাজু। এমন ভাবে হাঁটতো যে, সে যে ক্ষেত দিয়ে হাঁটছে সেটা তার নিজের, সে যা ইচ্ছে করতে পারে। যে ভাবে খুশী হাঁটতে পারে। দক্ষিণ দিকে আম বাগান। তার নতুন বাড়িটা আজ চারদিন হল দেখা হয়নি। তার পা গুলো তাকে আস্তে আস্তে, টানতে টানতে, সে দিকে নিয়ে এসেছে। বাগানের দক্ষিণ দিকে একটা শুকনো গাছ। তার কাছে একটি বাবলা গাছ। শুকনো কালো গাছের পাশে সবুজ কাঁটার গাছ। শুকনো গাছে অনেক গুলো লতা বেয়ে বেয়ে উঠেছে। আর সেই কালো শুকনো গাছে উঠেছে অসংখ্য সবুজ হলুদ রঙের লতা। অন্য প্রান্তে রাওয়াইয়া কাপুর বাতাবি বাগান। নামেই বাতাবি বাগান। আসলে আম গাছই বেশি। দীঘি থেকে তার নতুন বাড়িতে আসতে গেলে রাওয়াইয়ার বাগান পেরিয়ে আসতে হবে। আরও অনেক পথ আছে। তবে দীঘির কাছ থেকে রওনা হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এই মাত্র রাজু চারদিকে ঘুরে এসেছে। আবার ঘুরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার রাওয়াইয়ার বাগানের ভেতরে দিয়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

সেই বাগানের ভেতর দিয়ে যাবে বলে এগোতেই দেখে বেশ উঁচু বেড়া দেওয়া আছে। দুদিন আগেও এই বেড়ার অস্তিত্ব ছিলনা। মনটা তার ছ্যাঁক করে উঠল। দুটো পরিবারের মধ্যে উঁচু বেড়া উঠে গেল। প্রকাশ্যে অতগুলো লোকের মধ্যেই যেন বেড়া উঠে গেছে। গোটা গ্রাম

ছুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে রাজু নিজের নতুন বাড়িতে এলো।

এইতো সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রে রাজু তার এই নতুন বাড়িটা দেখাতে আনল লক্ষ্মীকে। তাকে আনার, তার এই ঘর গুলো ঘুরে ঘুরে দেখার দৃশ্যগুলো তার চোখের পাতায় লেগে আছে। জলজ্যান্ত সেই দৃশ্যগুলো না জানি আবার কবে বাস্তবে রূপায়িত হবে। মনসার উৎসবের পরেই বিয়ের কথা ছিল। তারপর গৃহ প্রবেশ হবে। সব ঠিক ঠাক। হঠাৎ কোথেকে কি যে ঘটে গেল তার নেই ঠিক। এখন বিয়ে যে কবে হবে আর গৃহ প্রবেশের জন্য যে কত দিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। বাড়িতে ঢোকার দরজা একটাই থাকবে। বাড়ির খিড়কির দিকে নলকূপ বসবে। যা করেছে তা লক্ষ্মীকে দেখানোর মত আর যা করবে তা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করার মত লাগল রাজুর। তার হাত ধরে যখন তাকে খিড়কির দিকে, সেই জ্যোৎস্না রাতে, নিয়ে যাচ্ছিল তখন লক্ষ্মী নিজের হাত টেনে নেয়নি। তার হাতে হাত রেখে খিড়কিতে যেতে খুব সঙ্কোচ বোধ করছিল লক্ষ্মী। কি মধুর সেই সঙ্কোচ।

রাজু এসব ভাবতে ভাবতে দক্ষিণের খিড়কির দিকে তাকাল। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। লক্ষ্মী সপেটা গাছের নিচে ভিজতে ভিজতে দাঁড়িয়ে রাজুর নতুন বাড়ির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্মী রাজুকে দেখে পালাতে গেলে রাজুর মনে হল যা দেখছে তা স্বপ্ন নয়।

'লক্ষ্মী!' রাজু জোরে ডাকল।

অবেগ-বিহ্বল ভঙ্গীমায় দাঁড়াল লক্ষ্মী। রাজু তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত দিতে গেল। লক্ষ্মী অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু সরতে পারল না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'বাড়িটা কদ্দূর কি হলো দেখতে এসেছ?' সাগ্রহে কথা বলতে গেল রাজু। গম্ভীর ভাবে 'না' বলে ঘাড় নাড়ল লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর সেই সঙ্কোচ ভাবটা যেন আর নেই। তার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম লক্ষ্মী রাজুর দিকে এভাবে তাকাচ্ছে।

ঐ চাউনির মধ্যে আগেকার সেই প্রেম ভালবাসার আকর্ষণ নেই। ব্যস্ততা আছে। আর ঐ ব্যস্ততাকে কার্যকরী করার সাহস আছে।

'আমাদের আর তোমাদের বাগানের মাঝ খানে একটা বেড়া তোলা হয়েছে।' বলল লক্ষ্মী।

'দেখেছি।' বিরক্ত হয়ে বলল রাজু।

'সেটা কি ভাবে তুলে ফেলা যায়?' লক্ষ্মী বলল।

সেই প্রশ্নের জবাব রাজু খুঁজে পাচ্ছে না। তরকারিতে দেওয়ার নেবুর জন্যে সেখানে এলো মল্লি। ওদের গলা শুনে সে দক্ষিণের খিড়কির দিকে তাকাল। ওর বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। হাঁক পাঁক করে এদিক ওদিক তাকাল। ওদিকের বাগান থেকে রাওয়াইয়া কাপুর কোন লোক দেখে ফেলছে কিনা কে জানে। তারপর সে পা টিপে টিপে ছুটে পালাল। দূরে কলা বাগানে কলাপাতা কাটছে গঙ্গাপ্পা। মল্লি সেদিকে ছুটে গেল। গঙ্গাপ্পার কাছে গিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওরে দাদা, লক্ষ্মীদি আর রাজু বাওয়া নতুন বাড়ির পিছনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে। তুই এক কাজ কর। তুই পূব দিকটা পাহারা দে আর আমি পশ্চিম দিকটা দেখছি। কেউ যেন ধারে কাছে না আসতে পারে।'

অতবড় দেহটাকে নিয়ে ছুটল গঙ্গাপ্পা। ছোটার মত হাঁটা তার। পূব দিকের সিংহদ্বারে গিয়ে সে দাঁড়াল। লাঠিতে চিবুক ঠেকিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগল সামনের দিকে। এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তার জীবন থাকতে একটি পাখিও ওপথ দিয়ে যেতে না পারে। মল্লি পশ্চিম দিকে ছুটে গেল। একটি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল সে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

'আসলে এই ঝগড়া এত তাড়াতাড়ি এতদূর কেন এবং কি করে যে গড়াল আমি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।' বলল রাজু।

'যে কোন এক পক্ষ এগিয়ে এসে মিটমাট করতে চাইলে এতদূর গড়াত না।' বলল লক্ষ্মী।

'তোমাদের রক্ষা আমার চুবড়িটাকে যদি নিচে না ফেলে দিত…' ক্ষীন কণ্ঠে বলল রাজু।

'আর বল না রক্ষার সব কাজে ফাঁকপাকানি আছে। যাক, অন্তত পান্দালু যদি অত অধৈর্য না হয়ে একটু ধীরে সুস্থে ভেবে কাজ করত তাহলে এত ঝামেলা হত না।' বলল লক্ষী।

'যাই ঘটুক না কেন, তুমি কিছুতেই ভুলতে পার না যে তুমি রাওয়াইয়া কাপুর মেয়ে।' বলল রাজু।

নোয়ানো মাথা তুলে মুহূর্তে লক্ষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাজুর দিকে। ঝড়ে গাছ নড়ার মত নড়ে উঠল সে। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে গেল নিজের বাগানের দিকে। রাজু থ বনে গেল। পর মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পেরে 'লক্ষী লক্ষী' বলে ডাকল। বেড়ার ওপারে, নিজের বাগানে চলে গেল লক্ষী। রাজু তাড়াতাড়ি বেড়ার কাছে গিয়ে বেড়া ডিঙোতে যাবে এমন সময় 'বাওয়া' বলে তার কাছে এসে, তার হাত ধরে, মল্লি বলে উঠল, 'না বাওয়া, বেড়া ডিঙোতে যেয়ো না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। কেউ দেখে ফেললে লক্ষীদিকে করাত দিয়ে কেটে ফেলবে। বাওয়া লক্ষীদির কাছে এখন যেয়ো না। তোমার হাত ধরে অনুরোধ করে বলছি, বাওয়া।'

রাজু থেমে গেল। বেড়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মল্লি বলল, 'বাওয়া, লক্ষীদিকে তো খুব বলছ, আচ্ছা তুমি কি ভুলতে পেরেছ যে তুমি সুব্বাইয়া কাপুর ছেলে?'

এ কথা বলে পায়রার মত উড়ে গেল মল্লি। সে তো উড়ে গেল বাতাসে ওড়ার মত। কিন্তু অস্থির এক জ্বালা বোধ করল রাজু। এই পাগলি মেয়েটা যে এত গভীর কথা কোনদিন বলতে পারবে তা সে আগে কখন ভাবতে পারেনি।

মল্লম্মার মন্দিরে পৌঁছানো পর্যন্ত লক্ষীর বুকের ধড়ফড়ানি কমেনি। মায়ের সামনে সাস্টাঙ্গে পড়ে হাউ মাউ করে সে কাঁদল। বাগান থেকে মন্দির পর্যন্ত আসার পথে সে যে কি ভাবে ছুটেছে; কিসের উপর যে তার পা পড়েছিল সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কোন জ্ঞান ছিল না

তখন। দুঃখের বোঝা বুকে করে যেন সে ছুটে এসেছে মায়ের মন্দিরে। মার কাছে নিবেদন করতে। পণাচারি তার কাছে এসে, তার কাঁধ ধরে তুলে বলল, 'মা লক্ষ্মী, খারাপ দিন চিরকাল থাকে না। মায়ের দয়ার সুদিন আসবেই। কেঁদোনা মা। দুদিন দেরি হলেও তোমাদের দুজনের মিলন মায়ের দয়ায় হবেই।'

'তা যে আর হওয়ার নয়! গোটা গ্রাম দুভাগ হয়ে গেছে। বাগানে বেড়া লাগানো হয়ে গেছে। সেই বেড়া আমাদের দুজনের মধ্যেও উঠে গেছে। এমন বেড়া পড়ে গেছে যে তা আর সহজে সরানো যাবে না।' বলতে বলতে কাঁদতে লাগল লক্ষ্মী।

রাওয়াইয়া দক্ষিণের বাগানে বেড়া দিল। কল্যাণ পাম্প্ তে দুটো ক্ষেতের মাঝে বেড়া দিচ্ছে সুব্বাইয়া। দীঘির প্রান্তে বেড়া শেষ হওয়ার মুখে এলো রাওয়াইয়া। ভেঙ্কায়া, ধর্মরাজু আর তাদের পেছনে ভেঙ্কটেশ, পেন্টাইয়া প্রভৃতি। পেন্টাইয়াকে জামিনে ছাড়িয়ে আনল ভেঙ্কায়া। ধর্মরাজু, লিঙ্গারাজু (জমি মাপার) শেকল আনল।

'সে দিনই বলেছিলাম আমার রাওয়াইয়া বাওয়ার ক্ষেতে সারভেয়ার এসেছে বলে। আমার কথায় কেউ কান দেয়নি।' বলল ধর্মরাজু।

'বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে ঐ পাথরটা ওখানেই আছে। এখন সরাতে বললে মরে গেলেও সরাবো না।' বলল পুন্নাইয়া।

'বেইমানী করে আমাদের জমি মেরে দেওয়ার তালে আছো নাকি?' বলল রাওয়াইয়া।

'কার জমি যে কে বেইমানী করে নিচ্ছে তার ফয়সলা কোর্টে গিয়ে করগে যাও।' বলল সুব্বাইয়া।

'বেড়া দাও।' বলল ভেঙ্কায়া।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সুব্বাইয়া।

খুঁটি পুঁততে গেলে পাপ্পালুকে ধাক্কা দিল ভেঙ্কটেশ। পুন্নাইয়া লিঙ্গরাজুর হাত থেকে জমি মাপার শেকল টান মেরে কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পরক্ষণে যা ঘটল তার ফলে কয়েকটা ঠ্যাং ভাঙল। কয়েক জনের মাথা ফাটল। অনেক রক্ত ঝরল।

বেড়ার ও দিকের কাক এদিকে এলে জানে মেরে ফেলবে। ক্ষেতে ও গাঁয়ে লোকে একা একা হাঁটা চলা বন্ধ করে দিল। লাঠিসোটা হাতে, দল বেঁধে চলা ফেরা করতে লাগল। দিনে অথবা রাতে কতকগুলো লাঠি একসঙ্গে যদি মাটিতেও পড়ে তবু লোকে আতঙ্কিত হয়। ভয়ঙ্কর কোন কিছু ঘটে যাচ্ছে মনে করে। এই কুঁড়ে ঘরের লোকের সঙ্গে ঐ কুঁড়ে ঘরের লোকের ঝগড়া বিবাদ হয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। একে অন্যের দু চোখের বিষ। শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গ্রামের শ'য়ে শ'য়ে কেস জমা হচ্ছে। পুলিশ বিশ্রাম পাচ্ছে না। শহরের উকিলদের হাত ভর্তি কাজ। কার ঘাড়ে যে কখন্ কোন্ বিপদের খাঁড়া নাববে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।

হঠাৎ কড়া শীতের একটি দিনে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ফসল ফলে গেছে, কাটা বাকি। ঠিক এমন সময় এল ঐ সর্বনাশা বৃষ্টি আর ঝড়। ফসল বাঁচাতে চাষীরা উঠে পড়ে লাগল। ভাল মন্দ, ঝগড়া বিবাদ, সরিয়ে রেখে ওরা সবাই মিলে ছুটল ক্ষেতে। উদ্দেশ্য এক। ফসল বাঁচানো। একদিন একরাত্রি টানা ক্ষেতেই ছিল জোয়ান পুরুষ আর মেয়েছেলে। সন্ধ্যে নাগাদ ঝড়ের গতি কিছুটা কমল। ক্ষেতে যারা কাজ করছে তাদের জন্য ভাত পোঁটলা বেঁধে নিয়ে গেল বাড়ির বুড়ো বুড়ি আর ছেলে মেয়েরা।

কয়েকটা ক্ষেত গাঁয়ের পশ্চিম দিকে লিঙ্ক নদীর ওপাশে আছে। যতটা সম্ভব ফসল যত্ন করে রাখতে না রাখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। কৃষকরা একটু দম নিল। সারাদিন পেটে দানা পানি কিছু পড়েনি। তাই খিদের জ্বালায়, ভেজা মাটিতে বসেই পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেল বাড়ি থেকে আনা ভাত। একটু জিরিয়ে, সবাই মিলে বাড়ির দিকে রওনা দিল ক্লান্তিতে দুলতে দুলতে। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি যুবক যুবতী সবাই। লিঙ্ক

নদীর জল এক হাঁটু বাড়ল। লোকের যাতায়াতের পথে পড়ে সেটা। ফেরা পথে অত জলে নামার আগে একটু দাঁড়ালো ওরা।

রাবি উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে নাবল ঐ জলে। রঙ্গা সামনে হাজির হল। রাবি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। রঙ্গা আবার তার দিকে পা বাড়াতে গেলে হাতির মত বিশাল দেহী গঙ্গাপ্পা হঠাৎ তার সামনে এল। নদীর ধার থেকে নাবতে থাকা লোকগুলোর নজর পড়ল সেদিকে। তাদের মনে পড়ল আগেকার ঝগড়ার কথা। কেউ কোন কথা না বলে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। গঙ্গাপ্পার পেছনে গেল কয়েক জন আর রঙ্গার দিকে দাঁড়াল কয়েকজন। রাবি এক ধার দিয়ে যেতে লাগল। তার পাশে পাশে যেতে লাগল গঙ্গাপ্পা। সে মুখের চুট্টাটা নাবিয়ে ঝড়ের মুখে জোরে থুথু ফেলল। সেই থুথু হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রঙ্গার দিকে পড়ল। রঙ্গা তৎক্ষণাৎ পেছনের দিকে তাকাল। তার পেছনে অতগুলো লোক আছে দেখে তার সাহস খুব বেড়ে গেল। পা চালিয়ে সে গঙ্গাপ্পার কাছে গেল। যারা পেরোচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের দাঁড়ানো দেখে মনে হল বারুদ গরম আছে। এত বৃষ্টিতেও তা ভেজেনি। শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা।

'আমার উপর থুথু ফেললে কেন ?' গর্জে উঠে প্রশ্ন করল রঙ্গা।

'তোমার উপর কে থুথু ফেলেছে ? আমি জলে ফেলেছি।' মাথা নেড়ে বলল গঙ্গাপ্পা।

'গাধার বাচ্চা কোথাকার।' বলে লাঠি তুলল রঙ্গা।

'মুখ সামলে কথা বল !' বলে তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গাপ্পা। মেয়েরা, বাচ্চারা হকচকিয়ে চিৎকার করতে লাগল। কোন দিকেই যাওয়ার পথ নেই। মারামারিতে সেখানকার সবাই দেখতে না দেখতে জড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ নদীতে বান এল। নদীর জলও ফুলতে লাগল। ঝগড়ার মধ্যে যারা ডুবে গিয়েছিল তারা এসব লক্ষ্য করেনি। কয়েকজন বুড়ো আর বাচ্চা চিৎকার করতে করতে পেরোচ্ছিল। বাদ বাকি লোকগুলো খুব উত্তেজিত। অন্য কোন পথ না ধরে, ওরা নদী পথেই এগোতে লাগল। ঝগড়া ছাড়া অন্য কোন দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ

নেই। কে মারতে আসছে, আর কাকে মারবে, এই তাদের চিন্তা। খুব ব্যস্ত, ক্ষিপ্ত এবং ক্ষিপ্র তাদের মেজাজ। রাজুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রঙ্গা। রাবি ধেয়ে এসে তাকে ধরে ডোবাতে গেল। গলা ডুবে গেছে তার। আর একটু হলে সে ডুবে যেত। হঠাৎ পুল্লি এসে তাকে বাঁচালো। সারা নদীতে যেন চৈ চৈ আর্তনাদ চিৎকার আর হুঙ্কার। কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। জলে যেন শত শত হাতির দাপাদাপি। নদীতে বান এসেছে। যারা তা লক্ষ্য করেছে তারা প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি করে তীরে গিয়ে উঠছে। রাজু তীর থেকে সেই দৃশ্য দেখল। যেসব ফসল ভিজে গেছে সে সব গাড়িতে তুলে সে পাঠিয়ে দিচ্ছিল।

নদীর উপর দিয়ে আড়াআড়ি যাচ্ছে গাড়ি। বুড়োবুড়ি কাচ্চা বাচ্চা আর মেয়েদের রাজু পার করে দিচ্ছে। নদীতে সোঁ সোঁ শব্দ করে বান আসছে। জলের ভয়ঙ্কর তীব্র গতি। অনেক দূরে ঘাট। ঘাট পর্যন্ত জল পৌঁছে গেছে। ফুঁসে ফুঁসে নদীর সে এক ভয়ঙ্কর রূপ। সাধারণত পায়ে হেঁটে যারা নদী পার হয় তারা ভাবতে পারে না নদীর এই ভয়ঙ্কর রূপ। এত অল্প সময়ে, এত দ্রুতগতিতে, নদীতে যে, মানুষ ডুবে যাওয়ার মত জল, এসে যাবে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। যারা সাঁতার জানে না তারা ভেসে যাচ্ছে। আর যারা জানে তারাও পারছে না সাঁতার কেটে ঘাটে উঠে আসতে। দিগন্তের উত্তর দিকটা কালো মেঘ আর কালো পাহাড়ে একাকার হয়ে গেছে। কী সেই ভয়ঙ্কর কালো রুদ্র রূপ। মাঝে মাঝে যখন বিদ্যুতের চমক জেগে ওঠে মেঘের বুক চিরে, তখন বোঝা যায় কোনটা পাহাড়, কোনটা মেঘ। পাহাড়ের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি যত তীব্র হয় পাহাড়ের উপর, নদীতে বান ডাকে তত বেশি। গ্রামের ক্ষতি না হলেও নদীর বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে সমস্ত গ্রামের মানুষের ফসল ভেসে যাবে। রাজু তাকিয়ে দেখছে না কে কোন্ দলের। যাকে পারছে জল থেকে উদ্ধার করে তীরে টেনে তুলছে। রাজু হাঁপিয়ে পড়েছে। তার বলদ গুলোও জিব্ ঝুলিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা আর পারছে না। শেষ খেপে রাজু দুজন বুড়ো ও দুটি বাচ্চাকে জল থেকে তীরে টেনে তুলে ঘাটে দাঁড়িয়ে

নদীর সেই মারাত্মক রূপ দেখছে আর ভাবছে, মানুষের প্রতি নদীর কোন দয়া মায়া নেই।

'সবাই ঘাটে উঠতে পেরেছে তো?' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পান্নালালকে জিজ্ঞেস করল রাজু।

পান্নালাল জবাব দিতে যাবে এমন সময় রাজু দেখতে পেল দশ পনের হাত দূরে রঙ্গার মাথা একবার ডুবছে আর ভাসছে। তার পেছনেই নজরে পড়ল রাবির মাথা। রাবি আপ্রাণ চেষ্টা করছে মাথাটা জল থেকে তোলার আর রঙ্গা তাকে ধরে চোবাচ্ছে। এ রকম হতে হতে রঙ্গাও আর চোবাতে পারছিল না, রাবিও আর উঠে আসতে পারছিল না। রঙ্গা তাকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছিল। তার মাথার চুল রঙ্গার শক্ত মুঠোর মধ্যে। অগত্যা রাজু আবার নামল জলে। রাজু রঙ্গার জামা ধরে টেনে তুলল তীরে। পেছনে পেছনে রাবি পা টানতে টানতে কোন রকমে উঠল ঘাটে। জলে ডোবার ফলে রাবির চোখ মুখ ভয়ঙ্কর রকমের ফোলা ও লাল দেখাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলল, 'আমাকে ডুবিয়ে মারার তাল করেছিল এই ঘাটের মড়া।'

রাবির কথা শুনে রঙ্গার উপর রাজুর রাগ আরও বেড়ে গেল। হঠাৎ তার হাতের একটা থাপ্পড় গিয়ে পড়ল রঙ্গার গালে। রঙ্গা ছিটকে পড়ে গেল। উঠে রাজুর কাছে এসে কি যেন সে করতে চাইল। কিন্তু রাজু ততক্ষণে সরে গেল। ঘাটে উঠতে উঠতে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলল, 'তোকে যদি মাটিতে না পুঁতে ফেলি তো আমার নাম নেই।'

তারপর রঙ্গা চলে গেল। রাজু পা টানতে টানতে চলেছে। তার মনে শরীরে ক্লান্তির বোঝা নেমে এসেছে। সে আর পারছে না হাঁটতে। পা ছড়িয়ে সে বসে পড়ল মাটিতে।

'এস বাওয়া, গা হাত পা ভাল করে মুছে নিয়ে গুগ্‌গুল দিয়ে ভাপ লাগিয়ে নিলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।' বলল মল্লি। নদীতে বান এসেছে শুনে ছুটে এসেছিল মল্লি।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রাজু। যন্ত্রের মত কোন রকমে হেঁটে এগোতে লাগল বাড়ির দিকে।

রাত্রে মনসার মন্দিরে আরতি দিয়ে গণাচারি দেবীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। মায়ের চোখে কোন্ ভাব ফুটে উঠল কে জানে। গণাচারি বলল, 'মা, তোমার ছেলেমেয়েদের উপর তুমি মা হয়ে এত রাগ করলে, ওরা বাঁচবে কি করে? কই, কোনদিন তো এ রকম ঝড় ওঠেনি? এমন ভয়ঙ্কর বান ডাকেনি?' তারপর গণাচারি মনে মনে বলল, 'এখন কাকে বলি দিতে চাও মা?'

বাড়ি পৌঁছে রঙ্গার চোখ মুখের অবস্থা যা হয়ে উঠে ছিল তাতে যে কোন লোক তাকে দেখে ভয় পেতে পারে। তখন তার সমস্ত শরীরে যেন আগুন জ্বলছিল।

'ঐ লোচ্চাটা আমাকে নদীতে টেনে ফেলে চোবানোর সময় একজনও জলে নেবে শয়তানটার হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। ডুবেলা এতগুলো লোককে পিণ্ডি দিয়ে হবে টা কি? দেখে নিও, এরা সবাই মিলে তোমাদের জ্যান্ত থাকতে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হারাম-জাদারা নুন খায় আমার, গুন গায় পরের…' দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে এক নাগাড়ে বকে যাচ্ছে রঙ্গা। দাওয়ায় খাটিয়ার উপর ওকে শুইয়ে তার গা হাত-পা সেঁকে দিচ্ছে সুরালু।

যে ভাবে ঝড় তুফানের মধ্যে নদীতে বান এসেছে সে অবস্থার মধ্যে রঙ্গা যে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে এতেই সুরালু নিজেকে ধন্য মনে করে। ঘটনা শুনে তার গলা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

রাওয়াইয়া কি যে করবে, কাকে ধরে যে মেরে ছাতু করে ফেলবে, কাকে যে চিবিয়ে খাবে ঠিক করতে না পেরেই যেন দাওয়ায় দ্রুত পায়-চারি করছে। তার চলাফেরা দেখে মনে হয় যেন এক রেগে যাওরা সিংহ আক্রোশে ঘোরাঘুরি করছে।

'রঙ্গা যা ভাবছে ঘটনা ঠিক তা…' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ভেঙ্কটেশ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে।

'চুপ কর, তোমরা আগে নাবো দাওয়া থেকে। আবার মুখ নেড়ে কথা বলা হচ্ছে!' বলল ধর্মরাজু। এমন ভাবে বলল যেন সে ইতিমধ্যে জেনে গেছে কি ঘটেছে আর অপরাধ কার। সেখানে যা ঘটেছিল

কিছুক্ষণ আগে তা সে নিজেই শুনেছে পেন্টাইয়ার কাছে। ভেঙ্কান্নাও তার কাছেই শুনেছে। মারামারির আসল কারণ রাওয়াইয়া এখনও জানে না। ভেঙ্কান্না ও ধর্মরাজু দুজনে চায় না যে আসল কারণ রাওয়াইয়া জানুক। সেই জন্যই ওদের সবাইকে ধমক দিয়ে দাওয়া থেকে নাবিয়ে দিল ধর্মরাজু। আসল কারণ রাওয়াইয়াকে না জানানোর জন্য কিছুটা ইশারায়, কিছুটা ধমক দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেও ধর্মরাজুর যেন শান্তি হচ্ছিল না। কি জানি কে কোন কথা মুখ ফস্‌কে বলে ফেলে সেই ভয়ে ধর্মরাজু সাত তাড়াতাড়ি রাওয়াইকে নিয়ে একটু সরে গেল সেখান থেকে। তার অতঙ্ক, কিছু একটা ফাঁস হলেই রাওয়াইয়া রঙ্গার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দারুণ এক গোপন উপদেশ দেবার ভঙ্গিমায় ধর্মরাজু বলল, 'রাওয়া, যত সাক্ষী প্রয়োজন হবে পাবো। একটা ক্রিমিনাল কেস ঠুকে দিলে হয়না? ঐ গুণ্ডা ছোকরাটাকে বেশ কিছু দিন জেলের জল পানি খাইয়ে আনা যেত!'

'ক্ষমতা থাকলে গাঁয়ে বসেই জেলের জলপানি খাওয়ানোর মত শাস্তি দেওয়া যায়। কোর্টে কারা যায়? যারা দুর্বল, যাদের ক্ষমতা নেই, আমরা যাব কোন্ দুঃখে?' বলল রাওয়াইয়া।

কেস করার ব্যাপারে রাওয়াইয়ার অন্য একটা মস্ত বড় বাধা অছে। রঙ্গার সেবা শুশ্রূষা যখন পুরোদমে চলছিল সেই সময় কোমাটি হনুমন্তাইয়া এসে বলল, 'দাদা কি বলব! আপনার ভাবী জামাই দেবতুল্য, মহামানব। উনি যদি ঐ ভয়ঙ্কর বান আসার সময় লোক জনকে উদ্ধার না করতেন তাহলে গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক ডুবে মরত! কোন্ লোকটা নিজের, কোন্ লোকটা পরের কোন দিকে সে তাকায়নি। যত জনকে পেরেছে উদ্ধার করেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে অনেক জনকে উদ্ধার না করলে গাঁ উজাড় হয়ে যেত। পেন্টাইয়ার বউকে, ভেঙ্কটেশের বাবাকে রাজুই তো টেনে তুলল তীরে।

দুটো বড় চাষী পরিবারের মিল থাকলে গ্রামে শান্তি থাকে। তার ব্যবসার পক্ষেও গ্রামের এই শান্তি প্রয়োজন। গাঁয়ের ঝগড়া এ ভাবে

বাড়তে থাকলে যে কোন দিন তার ঘাড়েও বিপদ এসে পড়তে পারে। তাই সে অনেক ভেবে চিন্তে রাজুকে 'আপনার ভাবী জামাই' বলল। তাকে রঙ্গাইয়া যা করেছে তা রাওয়াইয়াকে বললে যে ভেকায়া তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—তা সে ভাল ভাবেই জানে। তাই বেশি ক্ষণ না দাঁড়িয়ে রঙ্গার দিকে এক বার তাকিয়ে হনুমন্তাইয়া সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ কেটে পড়ল।

রঙ্গা সমানে বকবক করে যাচ্ছিল। সেই কথাগুলোরাওয়াইয়ার কানে যাচ্ছিল। কিন্তু তার মনে গেঁথে রয়েছে হনুমন্তাইয়ার কথাগুলো। কে কোন দলের ভ্রূক্ষেপ না করে রাজু সবাইকে সাহায্য করেছে। তাহলে সে রঙ্গাকে চোবালো কেন? রঙ্গা নিশ্চয় এমন কিছু করেছে যার জন্য তাকে চোবানো হয়েছে। রাওয়াইয়ার মনে এই প্রশ্ন আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সেই জন্যই সে আরও ভাল ভাবে ঠিক করে নিল যে রাজুর বিরুদ্ধে কেস করতে যাবেনা। তার আর একটি কারণ আছে। কোর্টে কেস উঠলে বিচারক তো শুধু তার কথাই শুনবে না। ওদের কথাও শুনবে। ফলে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে। রঙ্গার কোন কেচ্ছা যদি কোর্টে ওঠে তাহলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। গ্রামে ঢি ঢি পড়ে যাবে। গাঁয়ের চারজন রাওয়াইয়াকে এখনও বিচার করতে ডাকে। অপর পক্ষের সাক্ষী যদি রঙ্গার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথাও বলে তাহলেও সে কথা ছড়িয়ে পড়বে। আর খারাপ কথা তাড়াতাড়ি ছড়ায়। ছড়ানো মানেই তার মান-সম্মান খাটো হওয়া।

মল্লম্মার উৎসবের দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটল তার সমস্ত কিছুর জন্য শুব্বাইয়া আর রাজু যে দায়ী সে ব্যাপারে রাওয়াইয়ার কোন সন্দেহ নেই। এর মধ্যে রঙ্গা হয়ত কিছু ছেলে মানুষী করে থাকতে পারে কিন্তু তার বেশী নয়। তবে ঝগড়া ঝাঁটি জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে শুব্বাইয়ার ভূমিকাই প্রধান। যাই হোক না কেন সোজা তার কাছে এসে বলতে পারত, 'রাওয়াইয়া যা হয়েছে, হয়েছে। কে যে ভাল, কে যে মন্দ সে বিচার পরে হবে। এখন আমরা একটা মিটমাট করি। গ্রামে এই ধরণের ঝগড়া যদি চলতে থাকে শেষ পর্যন্ত তাতে আমাদের ক্ষতি।'

সুব্বাইয়া কি জানে না যে সে ন্যায় পথে চলে? অন্যায় সে করে না? আসল কথা সে ধরতে পারেনি। রাজুর ট্রাক্টর আনার পর থেকেই গাঁয়ের মানুষের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। তারপর বেশ কয়েক জন দিন মজুরকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তার ফলে লোকের মনে রাগ জমেছে। এখন দুই চাষীর সামান্য ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে ওরা যা মন চায় তাই করছে। এই সাধারণ ব্যাপার কেন যে সুব্বাইয়ার মাথায় ঢোকে না তা রাওয়াইয়া ভেবে পায়না। একবার দিন মজুররা সব এসেছিল সুব্বাইয়ার কাছে। তাদের দুঃখের কথা শুনে তাদের হাতে দশ টাকা দিয়ে বিদেয় করল। ঐ দশ টাকা দিয়েই নাকি আমি ওদের বলেছি তাড়ি খেয়ে মল্লম্মার মেলায় হৈ চৈ বাধিয়ে দাও।

লক্ষ্মী দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিল, দেখছিল। সব শুনে, জেনে তার মন খারাপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে নিজের ঘরে নীরবে চলে গেল!

মল্লিকে সদর দরজা দিয়ে, আস্তে আস্তে পা ফেলে আসতে দেখে, রঙ্গা রেগে মেগে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এসেছ?'

'দিদিকে দেখতে।' বলল মল্লি।

'তোমার বাওয়া পাঠিয়েছে বুঝি? কথা চালাচালি করতে এসেছ?' বলল ভেঙ্কাম্মা।

'কাকু, দেখছেন?' মল্লি রাওয়াইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল। তার কাছ থেকে বাধা না পেয়ে এগিয়ে গেল মল্লি।

'মল্লি' বলে ডাক দিল লক্ষ্মী অলিন্দে দাঁড়িয়ে। মল্লি সেখানেই থেমে উপরের দিকে তাকল।

'লজ্জা করেনা অমন ভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে?' বলল রঙ্গা।

মল্লি আবার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রাওয়াইয়ার মনটা খচ্ করে উঠল। সে জানে মল্লি বড় সরল মেয়ে। তার মনে কোন ঘোর প্যাচ নেই।

'অত খ্যাঁক খ্যাঁক করছিস কেন? বেচারা পাগলী মেয়ে। ওকে অত কড়া কথা বলার দরকার কি?' বলল রাওয়াইয়া।

মল্লি বলতে মুরালুর মন সহানুভূতিতে ভরে যায়। তাকে আদর করতে তার ভীষণ ইচ্ছে জাগে।

'যাও মা, উপরে যাও।' বলল মুরালু। রাওয়াইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রঙ্গা বুঝল তার আর কোন কথা বলা উচিত হবে না। ভেঙ্কান্নাও অবস্থা বুঝে চুপ করে রইল। মল্লি সুড় সুড় করে উপরে উঠে গেল।

এতদিন ধরে যে সাধনা চলছে তা যেন পরিণতির মুখে ব্যর্থ হতে চলছে। মল্লিকে জড়িয়ে ধরে লক্ষ্মী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল

'কেঁদোনা দিদি, মাঝ পথে যে বাধা আসে তা মাঝ পথেই শেষ হয়ে যায়। মায়ের দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।' মল্লি খুব গম্ভীর ভাবে আস্তে আস্তে কথা গুলো বলল। তার কথা শুনে লক্ষ্মীর মনে হল যেন তার গায়ে কেউ শান্তির প্রলেপ দিচ্ছে।

'কি ব্যাপার দিদি, একেবারে ক্ষেতে আসাই বন্ধ করে দিলে যে?' বলল মল্লি।

'কি করে আসব?' বলল লক্ষ্মী।

'বেটাছেলেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে, তাতে দীঘি কি দোষ করল বল? তেঁতুল গাছটার কি অপরাধ? দিদি, তুমি না এলে ক্ষেত-গুলো কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকে। রোজ বাঁধা গরুটাকে নিয়ে ক্ষেতে যাই। এই তো সে-দিন গরুটার বাচ্চা হল। মামা আমাকে বললে, গরু চরাতে তুই ক্ষেতে যাচ্ছিস কেন? তার জন্য তো আলাদা লোক রয়েছে। আমি বলি, যেই হোক কাজ হওয়া নিয়ে কথা। খুব ভোরে তো, বাছুরটা ওঠে। কি লাফান লাফায়। এক দিন ভোরে খুব মজা হয়েছে। বাছুরটা ছুটতে ছুটতে একেবারে সদর দরজা দিয়ে তোমাদের বাড়িতে ঢুকে গেছে। পা টিপে টিপে আমিও ঢুকলাম তোমাদের সদর দরজা দিয়ে। বাছুরটা কিছুতেই বাগ মানেনা! ফিরতে চায় না এখান থেকে। শেষে একথা সেকথা বলে বুঝিয়ে বাছুরটাকে বাড়ি নিয়ে যাই। বাওয়ার সেদিন খুব রাগ হল বাছুরটার উপর।'

গ্রামে চলছে মাথা ফাটাফাটি। প্রত্যেকের মুখে ঝগড়ার কথা। এ ওকে দোষ দিচ্ছে, ও তাকে দোষ দিচ্ছে। আর মল্লির সেদিকে খেয়াল

নেই। কত স্বাভাবিক ভাবে হাসি খুশী মেজাজে বাছুরের গপ্পো করছে। এত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, এত গালাগালির মধ্যে মল্লি নিজেকে কেমন পরিচ্ছন্ন রেখেছে। মল্লির কথা শুনতে শুনতে লক্ষ্মীর মনে হল যেন অতীতের কোন এক সুদিনে, বসে বসে গপ্পো শুনছে। তার মন কোথায়, কোন অতীতের দিকে চলে গেল। মনে হল ঐ সব কথাই শাশ্বত। বাকি যা কিছু ঘটছে সব ক্ষণিকের। এই সব খবর এত নিশ্চিন্ত মনে যে বলতে পারে সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, ওর কথা শুনে মনে হল গাঁয়ের আকাশ থেকে যেন কালো মেঘ সরে যাচ্ছে। মল্লি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী আবার দুঃখে ভেঙে পড়ল। প্রত্যেক দিন 'যখনই সুযোগ পাব তখনই আসব' বলে মল্লি ফিরে গেল।

মল্লি মন্দিরের পেছনে বসে চিঠি লিখতে শুরু করল বাওয়াকে: 'লক্ষ্মীদিকে দেখে এলাম। বেচারা কেঁদে কেটে ভেঙ্গে পড়ছে।' চিঠিটাকে পুরোন চিঠিগুলোর খামে রেখে বুকের ভেতর রেখে দিল।

ক্ষেতের মাঝে বেড়া। বেড়ার একদিকে রাজু, অন্যদিকে লক্ষ্মী। রাজুর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি লক্ষ্মী। এই অবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ করা যে বিপদ্জনক তা লক্ষ্মী জানে। তবু তেঁতুল গাছের কাছে যখন এল তখন তার মনে হল বাওয়ার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত। তারপর যখন দেখতে পেল তখন একটু কাছে না এসে পারলো না। আসার পর রাজুর কথার জবাব না দিয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কি করে?

'কি বলছেন তোমার বাবা?' বলল রাজু।

লক্ষ্মীর মন ছ্যাঁক করে উঠল। এতদিন রাওয়াইয়া তার কাছে ছিল মামা। এখন হল লক্ষ্মীর বাবা। লক্ষ্মী তার ঐ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, 'এই বেড়াটা কি থাকবে?'

রাজু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'এ বেড়াটা যে কেন দেওয়া হল, কি ভাবে কে তুলবে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।' বলল সে।

'কোন এক পক্ষ জিদ্ কমালে বেড়া উঠে যেতো। সামনা সামনি

বসে কথাবার্তা বললেও এতটা বাড়াবাড়ি হত না…কোন দিন কি কোন ব্যাপারে এটা তোমাদের, ওটা আমাদের বলে প্রশ্ন উঠেছিল? কত মিলে মিশে থাকতাম ছুটো পরিবারের লোক…' লক্ষ্মী থেমে থেমে বলল কথাগুলো।

'আমি সব ভুলে এগিয়ে গেলেও ঐ রঙ্গা, তোমার দাদা, তোমার বাবার সাথে কি কথা বলতে দেবে?'

আবার তোমার বাবা শুনে লক্ষ্মী অসহায় ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। আস্তে আস্তে বলল, 'রঙ্গার রাগটাই কি প্রধান? না কি ওর চেয়েও তোমার রাগ কোন অংশে কম? নদীতে বান আসার সুযোগে রঙ্গাকে ওরকম না করলে কি হত না?'

'আমি না থাকলে রাবিকে সে মেরেই ফেলতো? আমার জন্যই ওরা ছুজনেই জল থেকে উঠতে পারলো। না হলে জলে ভেসে যেতো। রঙ্গা কি করেছে তা আর বলছি না। কারণ সে যাই করুক না কেন তোমার বাবা তার পক্ষেই কথা বলবে।'

'এতদিন আমার মামা বলতে। এখন সেই কখন থেকে শুনছি তোমার বাবা, তোমার বাবা বলছ। ব্যাপার কি?' লক্ষ্মী মনের প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারল না।

'ওরা এদের কাছ থেকে যত দূরে থাকতে চাইবে এরাও ওদের কাছ থেকে তত দূরেই থাকবে।' বলল রাজু।

রাজুর কথাগুলো লক্ষ্মীর বুকে ছুঁচের মতো বিঁধল। নিজেকে সামলে নিয়ে লক্ষ্মী বলল, 'সেই জন্যই তো আমি বলছি যে কোন এক পক্ষকে কাছে আসতে হবে। এলেই অপর পক্ষ আরও কাছে আসবে।'

'বাঃ, এই বুদ্ধিটা তোমার বাবাকে দিতে পারলে না?'

'তুমি বুঝবে বলেই বড় আশা নিয়ে বলছি। আমার বাবাই হোক আর তোমার বাবাই হোক, ছুজনেই সেকেলে লোক। ছুজনেরই জিদ্ আছে। ভেবেছিলাম তুমি এদের থেকে আলাদা।' লক্ষ্মী আর বলতে পারল না। তার গলায় যেন সিসের দলা আটকে গেল।

রাজুরও অনেক অভিযোগ অনুযোগ আছে। তার ট্রাক্টর নিয়ে চাষ

আবাদের কাজ করা রাওয়াইয়ার ইচ্ছে নয়। ফসল বেশী করে হোক, এটা হয়ত তিনি চান না। তার পরিবার আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে চাষ আবাদের কাজে এগিয়ে যাক, নাম করুক, ফসল বাড়াক—এটা তিনি চান না। সেই জন্যই দিন মজুর আর চাষীদের ক্ষেপিয়ে মল্লম্মার উৎসবের দিন সমস্ত অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিলেন। এসব যে সত্য, সে ব্যাপারে রাজুর কোন সন্দেহ নেই। সে জন্যেই তাদের বাড়িতে গিয়ে রাওয়াইয়ার উচিত ক্ষমা চাওয়া। রাজু এসব কথা ভাবল বটে কিন্তু লক্ষ্মীর মুখের উপর কথাগুলো বলতে পারল না।

'তোমার বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গালাগাল দিলেও কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আড়ালে থেকে যা করছেন তাতে কি আর……

'আমার বাবা জীবন গেলেও অন্যায় কাজ করেন না।' বলল লক্ষ্মী রাগে ফুলতে ফুলতে।

'তাহলে কি আমরা করছি?' রাজুর প্রশ্ন।

'কে যে ন্যায় করছে আর কে যে অন্যায় করছে তার বিচার মল্লম্মাই করবেন। মনে রাগ, হিংসা, দ্বেষ ঢুকলে অপরের দোষ ত্রুটিগুলো বড় হয়ে নজরে পড়ে।' বলল লক্ষ্মী।

এদিকে বেড়ার এপারের রাজুদের গরু বেড়ার অন্য পারের গরুর গলা চেটে আদর করছে। এর গলা ও চাটছে, ওর গলা এ চাটছে। রাজু ও লক্ষ্মীর নজর পড়ল ঐ দিকে। গরুদের আদর করা দেখে দুজনেই যেন একটু লজ্জা পেল।

'ওরাও বেড়া মানছে না।' লক্ষ্মী বলল।

'ওদের যা বুদ্ধি আছে আমাদের তা নেই।' রাজু বলল।

ওদের প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন এগিয়ে এল রঙ্গা আর ভেঙ্কাম্মা।

'ছি ছি ছি···লজ্জাও করে না অন্য এক পুরুষের সঙ্গে দাঁত বের করে কথা বলতে।' চোখে মুখে ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে ভেঙ্কাম্মা বলল।

'চল।' বলল রঙ্গা।

দুজনে দুটো হাত ধরে লক্ষ্মীকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

মুহূর্তে রাজুর ইচ্ছে করল ওই অপমানের হাত থেকে লক্ষ্মীকে মুক্ত করে আনার। কিন্তু তার হাত-পা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছিল। দূরে দাঁড়িয়ে সুব্বাইয়া ও পুন্নাইয়া ঘটনা দেখছিল।

ঘটনার বিবরণ শুনে রাওয়াইয়ার মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোল। 'আমার কপালে যে এ রকম একটা নচ্ছার মেয়ে জন্মাবে……'

'কথার ছিরি দেখ! যা মুখে আসবে তাই বলবে।' বলল সুরালু। তার মনের ইচ্ছে আজ হোক, কাল হোক, একদিন না একদিন এই ঝগড়ার শেষ হবেই। লক্ষ্মীকে সুব্বাইয়ার বাড়িতে যেতেই হবে বউ হয়ে। দুই পরিবারের মধ্যে আজ কথা বন্ধ হয়ে গেলেও, মুখ দেখা দেখি আজ না হলেও একদিন হবেই। দুটো পরিবারের মধ্যে মিল না হয়ে পারে না। তার মনের এই দৃঢ় বিশ্বাস কোন দিন প্রকাশ না করলেও সাহসে ভর করে আজ আর না বলে পারল না।

'একদিন তো ওদের বাড়িতে যেতেই হবে।' সুরালু বলল।

'কি বললে? ওদের বাড়িতে পাঠানোর চেয়েও ওর গলা টিপে মেরে ফেলা অনেক ভালো।' বলল ভেঙ্কায়া।

বাপের সামনে কোন দিন এই ধরনের কথা সে বলেনি। রাওয়-ইয়ার মাথায় অনেক প্রশ্ন গিজ্ গিজ্ করছিল। মেয়ের প্রতি তার আদরের সীমা নেই। আবার সুব্বাইয়া কাপুর নাম শুনলেই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। মেয়েকে কোন দিন কড়া কথা সে বলেনি। বউ ঐ কথা না বললেও সে নিজেই হয়ত বলত। মুখে না বললেও ঐ কথাই তার মনে গেঁথে আছে। ঠিক যেন জলের উপর এক ফোঁটা তেল। জল গুলিয়ে গেল তাই ঐ এক ফোঁটা তেল নড়ে গেছে। একটি টিপের মত দেখাচ্ছে না। জল স্থির হলে আবার ফুটে উঠবে সেই তেলের ফোঁটা টিপ হয়ে।

'তোমার মধ্যেও দেখছি আনন্দ একেবারে উথ্‌লে পড়ছে। এত কাণ্ডের পরেও ঐ বাড়িতেই মেয়েকে দেবে?' রেগে বলল রাওয়াইয়া।

সুরালুর চোখ বড় বড় জলের ফোঁটায় ভরে গেল।

'মা গো!' বলে লক্ষ্মীকে বুকে টেনে নিল সে।

শাশুড়ীকে বকুনি দিচ্ছে দেখে বউমার খুব আনন্দ হল। দরজার আড়াল থেকে ছুঁচ ফোটানোর মত দুএকটি কথা সে ছুঁড়ে দিল।

'ঐ মেয়েটাকে বকে আর কি হবে! দিন কাল বদলে গেছে। সিনেমা এসে গেছে। পর্দায় সব দেখছে আর গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে তাই করছে। পথে পথে ঘোরা আর পথে ঘাটের ভালবাসা দুটোই বেড়ে গেছে।

লক্ষ্মী এতক্ষন কাঁদেনি। একটি কথাও বলেনি। তার মা যখন তাকে কাছে টেনে নিল, তখনও না। আতপ চালের ক্ষুদের মত ফুটেছে, গলেছে। তার বুক ফেটে গেছে কিন্তু মুখ ফোটেনি। সে চুপ মেরে গেছে অনেক ক্ষণ। বিশেষ করে রাজুর মুখে যা শুনল তাতে সে তার দাদার সঙ্গে রাজুর কোন তফাৎ খুঁজে পেলনা। ক্ষোভে দুঃখে সে গোমরাতে লাগল।

'বউদি, মেয়ে হয়ে জন্মালে কোন না কোন ইচ্ছে থাকবেই সিনেমা দেখে শেখার দরকার হয় না। বাবা অথবা উনি ঝগড়া মেটাতে চাইলে ঝগড়া মিটবে। আমার তাতে মঙ্গল হবে। গাঁয়ের মঙ্গল হবে। এসব কথা ভেবেই বড় আশা নিয়ে আমি গিয়েছিলাম।'

'তুমি কেঁদে ভাসিয়ে ওর পায়ে পড়লে কি ভেবেছ ওই লোচ্চাটা তোমার বাবার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে?' বলল ভেঙ্কাম্মা।

'ওই লোচ্চাটাকেই বাওয়া করার জন্য তো ছোটাছুটি করেছিলে একবার। তখন সে লোচ্চা ছিল না? এখন হয়েছে? তোমরা পুরুষরা, আবেগের চেয়ে বেশি রাগী। আমার জন্য কারো পায়ে কাউকে পড়তে হবে না। একের মাথা অন্যে ফাটিয়ে তোমরা নিজেদের আশ মেটাও।' লক্ষ্মী আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। রাওয়াইয়া অবাক হয়ে গেল। মেয়ের কথায় যে সত্য কতখানি তা তার বোধ গম্য হল। সে যে অত ধৈর্য ধরে বিচার করে সাহসের সঙ্গে এই কথা বলেছে তার জন্য মনে মনে রাওয়াইয়া বেশ গর্ব বোধ করল। তবে এক বিঘৎ মেয়ে তার চেয়ে বেশি পরিণত ও অভিজ্ঞ কথা বলেছে বলে তার গর্ববোধ স্বীকৃতি জানাতে চাইল না।

বড় ঘরের বারান্দায় সে পায়চারি করল অনেকক্ষণ। একটি ছোট্ট চিন্তা তার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে সাহস করে ক্ষেতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে 'কি ভাগ্নে' বললেইরাজু তৎক্ষণাৎ 'মামা' বলে উঠবে। সব রাগ ভুল বোঝাবুঝি মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। তবে সে কথা বলতে গেলে মনের উপর থেকে অনেকগুলো পর্দা সরাতে হবে—সেই গুলো বাধা হয়ে আছে! সেই পর্দাগুলো সরিয়ে, সেই চিন্তা ভালভাবে প্রকাশ পেতে পেতে অন্ধকার নেমে আসবে। অন্ধকার মনের গভীরের সত্যকে আরও বেশি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে। চোখে দেখা দৃশ্যগুলোর প্রভাব কাটিয়ে মনের গভীরের গোপন দৃশ্যগুলো পরিষ্কার রূপ ধরে।

অন্ধকারে রাওয়াইয়া যখন ক্ষেতের দিকে হাঁটছিল তখন গাঁয়ের পথে ঘাটের পুলিশকে সে দেখতে পায়নি। মল্লম্মার মন্দিরের সামনেটা আগের মতই রয়েছে। লোকজনের কথাবার্তা হৈ চৈ যেন আগের মতই জমে উঠেছে। খালের উপর সাঁকো—সে আর সুব্বাইয়া তৈরি করিয়ে ছিল। গাড়ি গুলো শহর থেকে ঐ সাঁকো দিয়ে গাঁয়ে ঢুকছে। 'কি ভাগ্নে?' এই কথাটাই বারবার তার মুখে ঘুর ঘুর করছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষেতে পৌঁছে ঐ কথাগুলো আর ঠোঁটের বাইরে আসতে পারল না। ক্ষেতের এক প্রান্তের যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তাতে সে থ বনে গেল। তার সব গুছোন কথাগুলো যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে গেল।

ক্ষেতের মাঝে ট্রাক্টর দাউ দাউ করে জ্বলছে। পাদ্দালু জল এনে তার উপর ঢালছিল বটে তবে আগুন নিভছে না। পুলিশ ভেঙ্কটেশ ও পেণ্টাইয়াকে ধরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ এসে তাদের ধরে না ফেললে ক্ষেতেই ওদের মেরে ফেলে দিত সুব্বাইয়া কাপুর লোকজন। রাজু মাথায় হাত দিয়ে আলের উপর বসে আছে। ঐ আগুনের শিখার মধ্যে সুব্বাইয়া ও পুন্নাইয়ার মুখগুলো রাগে ক্ষোভে যেন জ্বলছিল। বেড়ার এ পারে ধর্মরাজু, রঙ্গা, লিঙ্গরাজু, ভেঙ্কাম্মা প্রভৃতি ঠায় দাঁড়িয়ে

মজা দেখছে। ওদের মুখে আনন্দের উল্লাস উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই দৃশ্য দেখে রাওয়াইয়া ঘৃণায় বিরক্তিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। ট্রাক্টরে আগুন লাগানোর পেছনে তার ছেলে ও ধর্মরাজুর যে হাত আছে তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। ওদের উপর এত রাগ ধরল যে ওদের ধরে কেটে চিরে ফেলতে ইচ্ছে করল তার। হঠাৎ শোনা গেল সুব্বাইয়ার গলা। সুব্বাইয়া অকস্মাৎ ট্রাক্টরের আগুনে রাওয়াইয়াকে দেখতে পেল।

'ঐ তো এসেছে বড় বাবু। ওদের টাকা দিয়েই তো আগুন ধরিয়েছে। জামিনে ছাড়াও এসেছে।' উঁচু গলা সে বলল।

'কি বকছিস রে?' বলল রাওয়াইয়া। একে তো নানান বিষয় ভেবে তার মন ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল। এই মারাত্মক বিশ্রী ঘটনা দেখে তার মনে আরও যন্ত্রণা হল! যখনই কোন বেদনা হয় তা ক্রমে রাগে পরিণত হওয়া রাওয়াইয়ার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

'আমি টাকা দিয়ে আগুন ধরিয়েছি?' রাওয়াইয়া বলল।

'তুমি না দিলে ওদের আর কে টাকা দিতে পারে? যারা দুমুঠো খেতে পায় না তারা কোত্থেকে জোটাতে পারে চার টিন পেট্রোল? উৎসবের দিন তাড়ি খাইয়েছিলে। আজ পেট্রোল দিলে।' বলল সুব্বাইয়া।

রাওয়াইয়া ভেবে পেল না কি বলবে। রাগে কাঁপতে লাগল। পরক্ষণে হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে এগিয়ে এসে গর্জে উঠে বলল, 'কই আর একবার ঐ কথা বলত দেখি।'

সুব্বাইয়া আবার বলত। বললে রাওয়াইয়া যে কি করত তা সে নিজেই জানে না। পুলিশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দুজনের মাঝে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে বোমার মত প্রচণ্ড শব্দে ফাটল ট্রাক্টরের পেট্রোল ট্যাঙ্ক। লোহার টুকরো, জলন্ত পেট্রোল কিছুটা বেড়ার উপর, কিছুটা লোকের উপর গিয়ে পড়ল। কানের পর্দা ফাটানো ঐ ভয়ঙ্কর শব্দে সকলের দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। রাজু কিন্তু ঐ বসা জায়গা থেকে এক চুল নড়ল না। তার মন যেন একটা মস্ত বড় বরফের চাক হয়ে গেছে।

এত মারাত্মক শব্দেও ঐ রকম সলেনি। সেই সুযোগে পালিয়ে গেল ভেঙ্কটেশ ও পেন্টাইয়া। পুলিশ তাদের পেছনে ছুটল। অন্ধকারে ক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাগানে অথবা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দিল দুজনে। ঐ শব্দের পর মুহূর্তেই ধর্মরাজু ও লিঙ্গরাজুকে আর দেখা গেল না। ভেঙ্কাম্মা ও রজ্জা পা টিপে টিপে সরে পড়ল সেখান থেকে। দুজনেরই কানের পর্দা যেন ফেটে গেছে। দুজনের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। সুব্বাইয়া ও পুন্নাইয়া রাজুর কাছে ছুটে এল।

'কিরে লেগেছে নাকি?'

'না।' বলল রাজু।

'ওঠ বাড়ি ফিরে যাই।' বলল পুন্নাইয়া। রাজু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জ্বলন্ত ট্রাক্টরের দিকে তাকাল। মাথা নিচু করে সে যাচ্ছে। রাওয়াইয়া তার দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে হল, রাজুর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। এর জন্য সে নিজেই যে দায়ী এই কথা তার মনের এক কোনে খচ খচ করতে লাগল। কে যেন তাকেই নিন্দে করছে। সে নিজে কি এ সবের কারণ? এ কথা সেকথা ভাবতে ভাবতে ঠায় সে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। অনেক যুক্তি তর্ক করে মনে মনে ঠিক করে নিল যে সে এসবের জন্য দায়ী নয়। সে নিজের মনে জাগা প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে প্রমাণ করে নিল যে সে নির্দোষী। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল ঐ ট্রাক্টর পোড়ানো আগুন।

সুব্বাইয়া, রাজু ও পুন্নাইয়া বাড়ি ফিরে দেখতে পেল ধর্মরাজু শেষাম্মার সঙ্গে কথা বলছে। এত তাড়াতাড়ি ব্যাটাছেলেরা বাড়ি ফিরবে বলে ধারণা ছিল না ধর্মরাজুর। ওরা সবাই তাকে আর তার ছেলেকে দেখেছিল বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে। ক্ষেতে যা ঘটেছে তার পেছনে তারও হাত আছে ভাবতে পারে ওরা। ভেঙ্কাম্মা যে ভেঙ্কটেশকে টাকা দিয়েছিল তা সে জানে। সেই যে টাকা দিয়ে শহরে যাওয়ার পথে পেট্রোল কিনেছিল এবং সেটা যে ভেণী মাজির বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল তাও ধর্মরাজুর অজানা নয়। তবু এমন কিছু করতে

হবে যাতে তার উপর কারো কোন সন্দেহ না জাগে। কারণ মাত্র এক মাস পরে পঞ্চায়েতের নির্বাচন আসছে। অতীতে নামেই নির্বাচন হত। রাওয়াইয়া কাপু ও সুব্বাইয়া কাপু দুজনে আলোচনা করে পঞ্চায়েতের কোন্ পদে কাকে বসানো হবে তা ঠিক করে দিত। প্রেসিডেন্টের পদ নিতে এ-ওকে বলত আর ও-একে অনুরোধ করত। মাঝে মাঝে সেও সভ্য হিসেবে থাকত। তবে অতীতে সভ্যদের কোন ভূমিকা থাকত না। বড় কাপু দুজনে একমত হয়ে একজনকে প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত করত। ওদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার মত সাহসী সভ্য কেউ ছিল না। এখন পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দুটো পরিবারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিড় ধরেছে। নির্বাচনে লড়ালড়ি থাকবেই। সুব্বাইয়া যাদের ছাঁটাই করেছে সেই দিন-মজুর ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। তাদের রাওয়াইয়া পেছন থেকে মদত দিলেও ওরা কিন্তু ধর্মরাজুর কথাই শোনে। দুটো হাতি যখন ধস্তাধস্তি করে তখন লেয়ালের মধ্যে উৎসাহের জোয়ার আসে। পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ধর্মরাজুর মনের মত প্রার্থীকে দাঁড় করানো যেতে পারে। দুপক্ষের সঙ্গেই একটা সম্পর্ক রাখতে পারলে গোটা গ্রামকে নাচানো যাবে। তবে হঠাৎ সুব্বাইয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে সুব্বাইয়া নরম হয়ে তার সঙ্গে কথা নাও বলতে পারে। তার কথা যে অত সহজে পুরুষগুলো বিশ্বাস করে না তা সে ভালভাবেই জানে। সেই জন্য শেষাম্মার সঙ্গে আগে ভাগে আলাপ আলোচনা করে রাখলে ভবিষ্যতের পথ সুগম হতে পারে। আস্তে আস্তে শেষাম্মা কোন না কোন কথার মাঝে এই কথা সুব্বাইয়ার কানে তুলতেও পারে। ক্ষেতে যা ঘটল তা সবিস্তারে জানানোর পর ধর্মরাজু বলল, 'যা সত্য তা অপ্রিয় হলেও বলা উচিত, শেষাম্মা বউদি। আমার বিশ্বাস, আমার রাওয়াইয়া বাওয়া এ সব ব্যাপার জানে না। ঐ বাটা'ছেলে রঙ্গাই যত নষ্টের গোড়া। সেই ওদের টাকা দিয়ে পেট্রোল আনিয়েছে। তবু আমি একটা কথা বলব। সুব্বাইয়াদাদার রাগ একেবারে তার নাকের ডগায় থাকে। আমি একটা ভাল কথা বললেও তার মাথায় ঢোকে না। আসলে যুগ যুগ ধরে

যে ভেঙ্কটেশ প্রভৃতি যারা কাজ করছিল তাদের হঠাৎ ওভাবে তাগিয়ে দেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে। ট্রাক্টর কেনা যেতে পারে। যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ ভাল হতে পারে। ফসল বাড়তে পারে, আমি অস্বীকার করছি না। "ওরে তোরা শোন্, তোরা অন্য কোথাও চাকরির সন্ধান কর। তোদের চাকরি যোগাড় হওয়া পর্যন্ত আমি একটু একটু সাহায্য করছি। তোরা একেবারে ভেসে যাবি না। আমি আছি। আজ হোক কাল হোক যন্ত্র দিয়ে চাষ হবেই। কেউ এড়াতে পারবে না। কাজেই এখন থেকেই তোদের উচিত অন্য কোন কাজের সন্ধান করা।" এসব কথা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে বললে কি আর ওরা বুঝত না? অন্যদের কোন পরামর্শ দাদা শুনতে চায় না। নিজে যা ভাল মনে করে তাই করবে। অত গোঁ থাকলে কি আর তাকে দিয়ে কোন কাজ হয়? ওরা এখন ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওদের পেট জ্বলছে। ওদের কি আর জ্ঞান বুদ্ধি আছে। যা হোক একটা কাজ করে ফেলেছে রাগের মাথায়। তার জন্য ওদের জেলে পাঠালে কি সব সমস্যা মিটে যাবে? যাদের পেটে ভাত নেই তারা বাইরে থাকলেইবা কি আর জেলে থাকলেই বা কি।'

তার ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই এসে গেল সব্বাইয়া, পুন্নাইয়া ও রাজু। ধর্মরাজুর কথা বলার গতি হঠাৎ ব্রেক কষার মত থেমে গেল। একেবারে সে থ বনে গেল।

'বউমা, একটু জল দাও তো মা, খাব।' সুন্দরম্মাকে উদ্দেশ্য করে ধর্মরাজু বলল।

রাজু আস্তে আস্তে ধর্মরাজুর কাছে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বলল, 'এখান থেকে চলে যাও।'

ধর্মরাজুর পিলে চমকে গেল। রাজু যদি চড়াগলায় বলত তাহলে তার কর্তব্য ঠিক করতে দেরি লাগত না। সে হয়ত তৎক্ষণাৎ চলে যেত সেখান থেকে। রাজু যেহেতু খুব আস্তে করে বলেছে, এত আস্তে যে অন্যরা যাতে না শুনতে পায়, ফলে তৎক্ষণাৎ তার পক্ষে চলে যাওয়া উচিত ভেবেও আগের মতই সে কথা বলছিল। কোন এক অজানা আতঙ্কে

সে ঘেমে উঠছিল। কি যে করবে সেই মুহূর্তে কিছুই ভেবে উঠতে পারছেনা। ভাবনাগুলো, পর পর মাথায় আসছে না, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আবার রাজুর মুখের দিকে ভালো করে ধর্মরাজু তাকাতেও পারছে না। রাজুর মুখটা যেন আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে। ধোঁয়া উঠছে, যে কোন মুহূর্তে জ্বলন্ত লাভা তার গায়ে পড়তে পারে।

'না, ব্যাপার হচ্ছে কি জানো রাজু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি কিছু জানি না। ওরা লক্ষ্মীর জন্য কোন এক পাত্র খুঁজছিল। আমি বললাম, এটা ঘোরতর অন্যায়। এই কথাটাই বলার জন্য ছুটে গেলাম ক্ষেতে। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, আমার বুকটা খান্ খান্ হয়ে গেল। তিন হাজার ইয়ে করা যন্ত্র…'সে যে কি বলছে তার মানে সে নিজেই বোঝে না। আসলে সে কিছুই বলছি না। অভ্যেস বশত তার মুখ নড়ছিল। সে চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে। দেখছে এক বিরাট আগ্নেয়গিরি যার লাভায় সে যে কোন মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কথা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। ধর্মরাজুর কথাটা তখনও শেষ হয়নি।

রাজু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এক পা এক পা করে এমন ভাবে তার দিকে এলো যেন তাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। রাজু বলল, 'বাইরে যাও।'

ধর্মরাজু আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। পরক্ষণেই তাকে দেখা গেল রাওয়াইয়া কাপুর বাড়িতে।

'ও কি বলে, পুরোটা বলতে দেওয়া উচিত ছিল। ঐ কি পাত্র খোঁজা না কি বলছিল…' বলল পুন্নাইয়া। রাজু কোন কথা বলল না। কিছুই যেন ও ভাবতে পারছে না। ভাবতে ইচ্ছেও করছে না। নিরিবিলিতে কোথাও একটু একা বসতে পারলে তার ভাল লাগত। এতদিন যে সব অঘটন ঘটেছে, রাজুর ধারণা ছিল সেই সব জঘন্য ঘটনার পেছনে রাওয়াইয়ার কোন হাত নেই। ভেঙ্কায়া ও রজাই এসব করে বেড়াচ্ছে। সমস্ত কূট বুদ্ধির এবং কুকর্মের মূলে ওই দুজনই আছে। সে যে এ ধরনের জঘন্য কাজের মধ্যে নেই, সে ধারণাই রাজু এতদিন পোষণ করত। এখন তার সেই ভুল ধারণা একেবারে উবে গেছে। রাওয়াইয়া ক্ষেতের কাজ

সেরে কোন তাড়া না থাকায় মত আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ফিরতে লাগল। দীঘির ঘাটে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকাল। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলল না। চুপ চাপ সে বাড়ি ফিরল।

তারপর টানা সাতদিন রাওয়াইয়া ক্ষেতে গেল না। সেদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এলে বেড়াতে বেড়াতে আনমনা ভাবে চলে এল দীঘির ঘাটে। এসে কি যেন ভাবতে ভাবতে দীঘির জল ও আকাশের দিকে তাকাল। কারো সঙ্গে সে কথা বলছে না। তার সঙ্গেও কেউ কথা বলছে না।

রাঙ্গুর মনের এক কোণে একটা আশার আলো জ্বলত। রাওয়াইয়া ও রাঙ্গুর দীঘির ঘাটে অথবা ক্ষেতে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে। এ কথা সে কথার পর বিয়ের কথা উঠবে। এর মাঝে ঝগড়াঝাঁটির কথা কিছুই উঠবে না। বিয়ের কথা উঠলেই, যতই হোক, মেয়ের বিয়ে বলে কথা, রাওয়াইয়ার রাগ জল হয়ে যাবে। আজ হোক, কাল হোক, লক্ষ্মীর সঙ্গে রাঙ্গুর বিয়ে হবেই। সেদিন আজকের ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না। কিন্তু এই ধরনের বিশ্বাস রাঙ্গুর মনে আর নেই। রাওয়াইয়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে এখনও চিন্তিত নয়। রাঙ্গু আরো কত কি ভাবছিল। ছেদ পড়ল মল্লির ডাক শুনে।

'কুসুম কুসুম গরম জল করেছি বাওয়া, চান করবে এস।' কাছে এসে বলল মল্লি।

'গরম জলের কি দরকার ছিল? কি এমন শীত পড়ে গেছে যে গরম জল করতে গেলে?' বলল রাঙ্গু।

'সে কি কথা? ঠাণ্ডা হাওয়ার চোটে গালগুলো আর নাড়াতে পারছি না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আর তুমি বলছ শীত পড়েনি।' অবাক হয়ে বলল গঙ্গাম্মা।

রাঙ্গু পেছনের দিকে গেল। কুয়োর কাছে গিয়ে বুঝল শীত পড়েছে। গঙ্গাম্মা তার গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল। আর কোন দিন এত ভাল লাগেনি রাঙ্গুর। কুসুম কুসুম গরম জল তার শরীরের আনাচে কানাচে যে শীত ছিল তা সম্পূর্ণ বের করে দিল। ইচ্ছে করল আরো কিছুক্ষণ চান

করছে। মনের ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই দুটো ক্ষুধা, সেদিন রাত্রে তার ভাতের থালা একেবারে খালি করিয়ে ফেলল। বউদি যত ভাত বেড়েছিল সব সে খেয়ে নিল।

পঞ্চায়েত বসেছে। নির্বাচনের আগে সেটাই শেষ সভা। রাওয়াইয়া কি করবে না করবে আগে ভাগে ঠিক করেই এসেছে। গ্রামের উন্নতির জন্যে বড় ধরনের একটা পরিকল্পনার কথা ভেবে এসেছে। এই পরিকল্পনায় সবাইকে জড়াতে পারলে সব ভুল বোঝা বুঝির শেষ হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজে এগিয়ে গিয়ে, সুব্বাইয়া কাপুর কাছে গিয়ে, আগে মুখ খুললে মনে হবে দোষ ওরই। তাই নিজেই এগিয়ে ক্ষমা চাইতে না পেরে এ কথা সেকথা বলে আলাপ জমাচ্ছে, আগের মত মিশতে চাইছে। তার চেয়ে গাঁয়ের উন্নতির জন্য একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে এগোলে গাঁয়েরও উন্নতি হবে আর নিজেদের সম্পর্কও আগের মত হয়ে যাবে। তাই আগা পাস্তলা সব ভেবে করণমের প্রস্তাব রাওয়াইয়ার মনে ধরল। লিঙ্গ বিলের সমস্ত জল শেষ পর্যন্ত আর রাখা যায় না। নদী পথে সমুদ্রে চলে যায়। ঐ বিলকে নিয়ে একটা প্রোজেক্ট করতে পারলে চাষের উপকার হবে। গ্রামের উন্নতি হবে। এ নিয়ে পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার অনেক আগেই সরকারের কাছে পরিকল্পনা দাখিল করেছে। তবে সেটা অনুমোদিত হয়ে সরকারের দপ্তর থেকে আসতে আসতে অনেক দেরি হবে। তাই গাঁয়ের মানুষকে জড় করে শক্ত মাটি দিয়ে একটা বাঁধ তৈরি করতে পারলে বিলের জল দিয়ে সারা বছর চাষ আবাদ করা যাবে। ক্ষেতে আরও একটা ফসল তোলা যাবে। তা ছাড়া অনাবাদী জমিতেও চাষ হতে পারে। গাঁয়ের সবাইকে শ্রমদান করতে বলা যেতে পারে। বললেই গাঁয়ের লোক রাজী হয়ে যাবে। কিছু টাকা রাওয়াইয়া দান করলে সুব্বাইয়া কাপুও বাধ্য হবে কিছু টাকা ঢালতে। তখন দেখা যাবে সরকার কিছু না দিলেও প্রোজেক্ট কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে।

এ কথা সে কথার পর ধর্মরাজু ঐ প্রোজেক্টের কথা পাড়ল। ইঞ্জিনিয়ার প্রথমেই এমন সব কথা বলল যে অন্যদের উৎসাহ কেমন ঝিমিয়ে গেল। এই প্রোজেক্ট না কি নিজেরা ইচ্ছে করলেই হবে না। অনেক

বাধা আছে। সেদিনের মত টানা অত ঘন্টা বৃষ্টি পড়লে যত চওড়া দেওয়াল হোক না কেন ধুয়ে মুছে ভেসে যাবে। তার আগে খাল খোঁড়ার একটা পরিকল্পনা নিতে হবে। খালে স্লুইস্ মানে জল আসা যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা কপাট লাগাতে হবে। তা করতে গেলে খালটাকে আরও চওড়া করতে হবে। এর জন্য খালের পাশের কিছুটা জমি দখল করতে হবে। এই সব বাধার কথা সবিস্তারে বলায় সময় রাওয়াইয়া অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করছিল। শেষে এক সময় হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি ওসব কি করতে হবে না করতে হবে লিখে পরিকল্পনাটা আমাকে দিয়ে দিন। আমি কাল গিয়ে স্যাংশন করিয়ে আনব।'

তার কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার মনে মনে হেসে বলল, 'এ সব স্যাংশন হলেও প্রোজেক্ট কার্যকরি করতে ও পাকা করতে, চাই পাথর, সিমেণ্ট ইত্যাদি। সরকারকে প্রথমে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। টাকা স্যাংশন করবে তার পরে। সরকারি টেণ্ডার বেরুবে। কোন এক জন কনট্রাক্ট নেবে। তার পর কাজ হবে। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি বলছি তত তাড়াতাড়ি হবে না। সরকারি দপ্তরের ব্যাপার। খাঁজে খাঁজে পরিকল্পনা নিয়ে নানা কাণ্ড হবে। সব গাঁট পেরোলে তবে গিয়ে কাজ শুরু হবে। তখন...'

'আরে মশাই অত ঝামেলার মধ্যে আপনাকে এখন কে যেতে বলছে। আমার বাওয়া চায়, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে গাঁয়ের মঙ্গল হোক, গাঁয়ের মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। তাই আমার বাওয়া চান অবিলম্বে, প্রয়োজন হলে মাটি দিয়েও একটা বাঁধ হোক। আজকেই কাজ শুরু হোক। আর দেরি করতে আমার বাওয়া চান না। খাল চওড়া করলে, আপনিই তো বললেন বাঁধ টিকতে পারে। তবে আর দেরি কেন? বসে থাকার সময় নেই। গাঁয়ের মানুষের কষ্ট আর সহ্য করা যায় না।' বলল ধর্মরাজ।

'মাটির বাঁধ মজবুত করতে হলে খাল আরও অনেক বেশি চওড়া করতে হবে। অন্তত একশো একর জমি একোয়ার করতে হবে।

তখন বিলটাকে ঠিক কাজে লাগানো যাবে। সারা বছর ফসল ফলানো যাবে। বাঁধের উপর জলের তোড় ও ধাক্কা কমে যাবে।'

'তাতে কি হয়েছে? খালের আশপাশের জমি একোয়ার করতে হবে? করা যাবে!' বলল ধর্মরাজু।

'হ্যাঁ, তাতো করা যাবেই। অন্যের জমি একোয়ার করতে আর বাধা কোথায়? আর তাতে তোমার রাওয়ারও তো কোন ক্ষতি নেই! তবে যে জমির কথা বলা হচ্ছে সেটা যে আমাদের। তা ভুলে যেও না।' বলল সুব্বাইয়া।

রাওয়াইয়া জানত যে ধর্মরাজু জমিটা যে কার তা না জেনে কথা বলছে না। এই ধরনের কথা বলে সুব্বাইয়ার মুখ খোলাতে চায় গাঁয়ের উন্নতির ব্যাপারে। এতে যদি সুব্বাইয়া রাজী না হয় তাহলে লোকে বুঝবে যে সে গাঁয়ের মানুষের মঙ্গল চায় না। গাঁয়ের উন্নতি চায় না! আর তাহলেই রাওয়াইয়া এতদিন যে প্রচার করত, সুব্বাইয়া শুধু নিজের দিকটাই দেখে, গরিবদের কথা ভাবে না—সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। তাই বলল, 'সরকার একোয়ার করলে জমির ন্যায্য দাম দিয়ে দেয়।'

'সরকারের টাকা আমি চাই না। অত দরকার থাকলে ওখানে আমার পঞ্চাশ একর জমি আছে কিনে নাও। সরকারের কাছ থেকে তুমিই টাকাটা নিয়ে নাও! গাঁয়ের যাতে উন্নতি হয় তার জন্য তুমিই তো উঠে পড়ে লেগেছ। তুমিই এগিয়েছ।' বলল সুব্বাইয়া ব্যঙ্গ করে।

অগত্যা সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মোড় ঘোরানোর জন্য ইঞ্জিনিয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

'ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, এই প্রজেক্ট সম্পর্কে ইতি মধ্যেই মন্ত্রী মণ্ডলীর মধ্যে এক দফা আলোচনা হয়ে গেছে। আর সপ্তাখানেকের মধ্যেই ওদের সিদ্ধান্ত জানতে পারব। মনে হচ্ছে ওদের সিদ্ধান্ত আমাদের স্বার্থের অনুকূলেই হবে। তাই বলছি, আর কিছুদিন এ ব্যাপারটা নিয়ে ......মানে দিন কয়েক পরে আমরা এটা নিয়ে ভাবতে পারি··· প্রয়োজন হলে বিশেষ জরুরী সভা ডাকা যাবে।' বলল ইঞ্জিনিয়ার।

তারপরই সভা ভেঙে গেল। বোঝা গেল তারপর যে বিষয়েই

আলোচনা হোক না কেন ঠিক জমবে না। এরকম একটা অবস্থায় সুব্বাইয়া বলল, 'আমার একটা জরুরী কাজ আছে। আলোচনা যদি কিছু করার থাকে আপনারা করবেন। আমি উঠছি।' বলে সুব্বাইয়া চলে গেল। তারপর আর কেউ কোন কথা পাড়ল না। নতুন কোন কথা বলার সাহস কারও হল না।

পঞ্চায়েতের সভা সেই যে ভেঙ্গে গেল, নির্বাচনের আগে আর হল না। সভা ডাকার কথা কেউ তুলল না। কারও সাহস হল না সে প্রশ্ন তোলার। ইতিমধ্যে নির্বাচন এসে গেল।

'বাওয়া, এতদিন ধরে তুমি যে ভাল মানুষি করেছ তার জন্য তো সুব্বাইয়া অতবার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হতে পারল। হয়ে তো ও নিজের সুবিধার দিকটাই দেখল। গ্রামে এমন ভাবে চলাফেরা করে যেন ও এই গ্রামের রাজা। কথা বার্তায় আচার আচরণে সে তার দেমাক দেখায়। কি রকম জোরে জোরে কথা বলে। তুমি যদি একবার কোমর বেঁধে নির্বাচনে নাবে, তাহলে ওই অহঙ্কারের দাঁতগুলো মট্‌মট্‌ করে ভেঙ্গে ফেলা যাবে।' বলল ধর্মরাজু।

রাওয়াইয়া কোন কথা বলল না। ভেঙ্কায়া আর মঙ্গা ধর্মরাজুর কথায় তাল দিল। যতক্ষণ ওদের কাছে থাকে ততক্ষণ সুব্বাইয়ার বিরুদ্ধে নানা কথা শুনতে শুনতে তার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এক একবার ইচ্ছে করে ওদের সবাইকে একেবারে শুইয়ে দিতে। মাঝে মাঝে বড় ঘরে অথবা খিড়কির কাছে, সিঁড়িতে উঠতে নাবতে লক্ষ্মীর সাথে দেখা হয়। তাকে দেখে লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একটি কথাও বলে না। তখন রাওয়াইয়ার মনে হয় আর কেউ নয় সেই বুঝি অপরাধী। মনে মনে দগ্ধ সে হত। পরমুহূর্তে তার ব্যাপারে পুন্নাইয়া যে সম্পূর্ণ অসত্য কথা প্রচার করছে তা মনে পড়ল। দূরত্ব থেকেই যায়। ধর্মরাজুর ভূমিকা সব সময় তার ভাল লাগে না।

গুয়াইয়ার বিরুদ্ধে যে ভাবে সে উঠে পড়ে লেগেছে শেষে দুটো পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক চিরকালের মত না শেষ হয়ে যায়। তবে দিন কয়েক ধরে ভেঙ্কানা ও রঙ্গা ধর্মরাজুর সঙ্গে যেন একটু বেশি মাখামাখি করছে। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারে ধর্মরাজু লিঙ্গরাজু ভাল ভাবেই কাজে লাগবে বলে বিশ্বাস। সেই জন্যই কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি হলেও রাওয়াইয়া ঠিক বারণ করতে পারে না।

নির্বাচনে যে জয়ী কি করে হতে হয় তার কৌশল ধর্মরাজু ভাল ভাবেই জানে। তার প্রমাণ তার বক্তব্য। নিজেদের লোককে কেন এক্ষুনি জড়ো করা দরকার নেই তা বলতে গিয়ে ধর্মরাজু বলল, 'বাওয়া, যারা আমাদের লোক তারা তো আমাদের পক্ষে থাকবেই, প্রচার করে ওদের দলে টানার কোন দরকার নেই। যারা এদিকেও নেই ওদিকেও নেই, দু নৌকোয় পা দিয়ে চলে, তাদের মধ্যে যত বেশি জনকে আমরা টানতে পারি ততই আমাদের লাভ। তারপর চেষ্টা করতে হবে যারা আমাদের বিরোধী, তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে কিছু লোককে আমাদের দিকে টেনে নেওয়া। বাকিদের টানতে হবে লোভ দেখিয়ে। চল প্রথমেই যাই ওই গণাচারির কাছে।'

'গণাচারি আমাদের লোক নাকি?' রঙ্গা জিজ্ঞেস করল।

'যতক্ষণ না বুঝতে পারছি যে সে আমাদের লোক নয় ততক্ষণ তার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে হবে যেন সে আমাদের। আমাদের লোক না হলেও তাকে ছলে বলে কৌশলে আমাদের দিকে টানতে হবে। আর ওকে যদি টানতে পারি, ধরে নিতে পারো, কম করে এক হাজার ভোটও টানা হয়ে গেল। চল বাওয়া, আর এখন বসে বসে ভাবার সময় নেই।' ধর্মরাজু বলল। রঙ্গা গণাচারিকে ডেকে পাঠাতে বলল। বাধা দিয়ে ধর্মরাজু তাকে বলল, 'দেখ রঙ্গা, গণাচারিকে আমরা যদি ডেকে পাঠাই সে না এসে পারবে না। আসবে। কিন্তু কি ভেবে আসবে? ভাববে, যেহেতু এরা বড়লোক সেই জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। ভাববে, তাকে নির্দেশ দিতে, ধমক দিতে, ডেকে পাঠানো হয়েছে। ভাববে, খুব খারাপ দিন কাল পড়েছে। আর যদি আমরা তার বাড়িতে যাই, ভাববে, ওরে

বাবারে বাবা এত বড় লোক আমার ঘরে এসেছে! আমি ধন্য হলাম! এত দূর এসেছে যখন, যা চাইছে দেব। মনে রেখ, এটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা নির্বাচনে নাবছি। কাজেই ডেকে না পাঠিয়ে তার কাছে যাওয়া উচিত।'

গণাচারি মন্দিরেই ছিল। মন্দিরে মল্লম্মাকে যেখানে স্থাপিত করা হয়েছে তার পেছনের দেওয়াল সে সারাচ্ছিল মাটি দিয়ে। মন্দিরে রঙ করার সময় সামনের দিকেই চাকচিক্য বাড়ানো হয়েছিল। পেছনের দিকে ওরা নজর দেয়নি। এদিকে রাওয়াইয়া ধর্মরাজুরা গণাচারির খোঁজ করতে করতে একেবারে মন্দিরে ঢুকে গেল। এসে দেখল গণাচারি মাটি লেপ্‌ছে আর মল্লি হাত বাড়িয়ে মাটি যোগান দিচ্ছে। তার সামান্য দূরে রাজু দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা যে কেন এসেছে তা গণাচারি অনুমান করল। তবে এই প্রচার কার্যে স্বয়ং রাওয়াইয়া যে ঘুরবে তা সে ভাবতে পারেনি।

'আচ্ছা—সেই কবে মল্লম্মার গয়নাগাটি চুরি হয়েছিল, সেই তখন থেকে দেওয়ালের এই জায়গাটা আর সারানো হয়নি? এতদিন এই ব্যাপারটা আমার বাওয়াকে বলনি কেন? কবে সারানো হয়ে যেত!' বলল ধর্মরাজু।

'একবার সারানো হয়েছিল। তাপি মিস্ত্রি যেখানে সারিয়েছিল সেই খানেই আবার খারাপ হয়ে গেছে।' গণাচারি বলল।

'তোমার সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপারে কথা ছিল। এক্ষুনি একবার বাড়ি যাবে নাকি?' রাজুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে ভেঙ্কাম্মা বলল।

'কাজ হয়ে গেলেই আপনাদের বাড়ি যাব।' গণাচারি বলল।

'আমরা চলে যাচ্ছি। এখানেই কথা হতে পারে। মল্লি চলে এসো।' বলে রাজু সেখান থেকে সরে গেল। মল্লি কাদা মাখা হাতেই তাকে অনুসরণ করল।

'হাত ধুয়ে যাও মা!' বলল গণাচারি।

'দীঘিতে ধুয়ে নেব'খন'। মল্লি বলল। ওদের দুজনের চলে যাও-

তার পর ধর্মরাজু বলল, 'দেখলে তো বাওয়া, আমাদের আগেই ওরা নির্বাচনী প্রচারে নেবে গেছে।'

গণাচারি হাতের কাজ কিছুক্ষণ থামিয়ে রেখে ধর্মরাজু ও রাওয়াইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজু ঐ ধরনের কোন প্রসঙ্গ তোলেনি আমার কাছে। নির্বাচন যে এসে গেছে তা-ও আমার খেয়াল ছিল না। আমা--দের গ্রামে নির্বাচন তো নামে হয়। প্রত্যেক বার আপনারা দুজনে ভেবে-চিন্তে যা ঠিক করে দেন তাই হয়।' বলল গণাচারি। গণাচারির কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা ছোট্ট খোঁচা আছে মনে হল রাওয়াইয়ার কাছে। ভীষণ রাগ হল তার উপর। বলল, 'গ্রামে তো এখন আর দুজনে তেমন ইয়ে নেই।' আর না বলে সে থাকতে পারল না।

'দেখ গণাচারি, আমার বাওয়াকে কি তোমার খুব অপছন্দ হয়?' গ্রামের অন্য কারও সঙ্গে কি বাওয়ার তুলনা হয়? ঐপক্ষ যে কি ধরনের চক্রান্তকারী তা কি আর তোমার অজানা? বিশেষ করে মল্লম্মার উৎসবের দিনে কি ধরনের চক্রান্ত করে ছিল তা কি তুমি জাননা? মল্লম্মার উৎসবের দিনে কি ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি করে উৎসব পণ্ড করে দিল, তা তুমি নিশ্চয় স্বচক্ষে দেখেছ? গাঁয়ের গরিব মানুষের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতেও কসুর করেনি। এখনও যদি রাওয়াইয়ার হাতে পঞ্চায়েতের সমস্ত ভার না পড়ে তাহলে গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।' বলল ধর্মরাজু।

'করণম্ মশাই, কে যে বেঠিক তার বিচার মা মল্লম্মাই করবেন। কারও ভুল ধরার মত শক্তি আমার নেই। বাচ্চা বয়সে মাষ্টার মশাই-এর কাছে একটা কথা শুনেছিলাম, আজও তা মনে আছে। অন্য ছেলেরাও পড়া পারছে না বলে যখন তাদের দিকে তর্জনী দেখাতাম, তখন মাষ্টার মশাই বলতেন, বাপুহে, অন্যের দিকে যখন তর্জনী দেখাও তখন কি টের পাও যে বাকি তিনটে আঙুল নিজের দিকে থাকে? ওই তিনটে আঙুলের প্রশ্নের জবাব আগে দাও তারপর ওদের দিকে তাকাবে। ওদের দোষ দেখবে। তখন বুঝতে পারিনি কথাটার দাম কত বেশি। যত বড় হতে লাগলাম তত বেশি করে বুঝতে পারছি।

এই মায়ের নামে শপথ করে মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই না। অন্যের দোষ সম্পর্কে কেউ কিছু বললে কানে তুলি না।' এত সূক্ষ্ম ভাবে এত বড় সাহস দেখিয়ে গণাচারি যে এই ধরনের কথা বলবে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। রাওয়াইয়া বিস্মিত হল। ভেঙ্কান্নার ভীষণ রাগ ধরল। জিজ্ঞেস করল, 'অত কথার দরকার নেই, তোমার ভোট দেবে কিনা জানতে চাই।'

গণাচারি তৎক্ষনাৎ রাওয়াইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাওয়াইয়া মশাই, আমি আমার ভোট কাউকে দেব না। এই সময় নির্বাচন যাতে না হয় তারই বরং চেষ্টা করুন। তাতে এই গাঁয়ের মঙ্গল হবে।'

'ওদের মদত পেয়ে খুব গ্যাস হয়েছে।' বলল রঙ্গা।

'কি ছাগল পাগলের মতো কথা বলছ? গণাচারি মরে গেলেও ওদিকে যেতে পারে না। তুমি যা জান না সে ব্যাপারে কথা বল না। চল বাওয়া, পরে কথা বলা যাবে'খন।' বলল ধর্মরাজু।

গণাচারির বক্তব্য রাওয়াইয়ার মনের গভীরে গেঁথে গেল। তার ভেতরে যে এত জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি। তবে ঐ পরিবেশে তার বক্তব্য একটু কড়া মেজাজী মনে হয়েছে। তার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর, চারজনের দক্ষিণার উপর তাকে চলতে হয়, আর তার কিনা এতখানি মনের জোর। এতটা সাহস। সে গেছে তার কাছে নির্বাচনী প্রচার করতে আর তাকেই কিনা জ্ঞান দিল। রাওয়াইয়া সদর দরজা দিয়ে ঢোকার সময় দেখতে পেল নারকেল আর ফুল নিয়ে লক্ষ্মী বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায়?' বলল রাওয়াইয়া। লক্ষ্মীর হাতে ওসব দেখেই বুঝতে পেরেছিল তবু অনেকদিন পরে একটা অজুহাতে সে মেয়ের সঙ্গে হঠাৎ কথা বলল।

'মায়ের মন্দিরে যাচ্ছি।'

'একা যাচ্ছ?'

'মজন্মা আমাকে কি করবে? মজন্মার তো কোন দল নেই।' বলে লক্ষ্মী হন্ হন্ করে বাপের সামনে দিয়ে চলে গেল। ভেঙ্কান্না ও

রজা যেদিন লক্ষ্মীকে ক্ষেত থেকে টানতে টানতে নিয়ে এল সেদিন থেকেই বাপ মেয়েতে কথা নেই। যতবার লক্ষ্মীর সাথে দেখা হত রাওয়াইয়া আশা করত মেয়ে কিছু বলবে। কিন্তু কিছুই সে বলত না। মুখ ঘুরিয়ে, পাশ কাটিয়ে চলে যেত। তাকে দেখে কথা বলা তো দূরের কথা মেয়ের মুখ কেমন কঠিন হয়ে যেত। বাপের প্রতি শ্রদ্ধার চেয়েও ঘৃণাই যেন তার মনে জমত। তাই বলে মেয়েকে এর আগে কোন দিন দাঁড় করিয়ে কিছু বলার সাহসও রাওয়াইয়ার হয়নি। কারণ মেয়ে পরক্ষনেই কি বলতে কি বলে ফেলবে এই ছিল তার আশঙ্কা। তাই ইচ্ছে করেই রাওয়াইয়া মেয়েকে ঘাঁটায়নি। সে জানে লক্ষ্মী যদি তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কতকগুলো প্রশ্ন করে তাহলে তার জবাব দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। তাই ইদানীং সে লক্ষ্মীকে যেমন মনে মনে গভীর ভাবে স্নেহ করে তেমনি ভয়ও করে। মেয়ের এই সাহস এবং জেদ দেখে তারই বাবা হিসেবে সে গর্বও অনুভব করে। যতই হোক তারই রক্ত তো প্রবাহিত লক্ষ্মীর মধ্যেও। মেয়ের সম্পর্কে অনেক ভেবেও কোন সিদ্ধান্ত রাওয়াইয়া নিতে পারেনি। অন্যদিকে লক্ষ্মী ব্যথা বুকে চেপে গুমরে গুমরে দিন কাটায়। সে ব্যাপারেও রাওয়াইয়ার একটি গর্ব আছে। তার মেয়ে বলেই লক্ষ্মী পারছে এত সহ্য করতে। একথা সেকথা ভেবে রাওয়াইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'মজদুরের তো কোন দল নেই।' লক্ষ্মীর এই কথা ছুঁচের মতো রাওয়াইয়াকে বিঁধছে। তার মানে মেয়ে কি বলতে চায় গণাচারির কোন দল নেই! কি বলতে চেয়েছে মেয়ে! নাকি গণাচারিরই কোন কথা তার মুখ থেকে বেরোচ্ছে! কিছুক্ষণ আগে গণাচারির কাছ থেকে যে ভাষণ শুনে এসেছে তার সঙ্গে কি এই কথার কোন মিল নেই? গণাচারি ধর্মরাজুকে বললেও তাকেই তো শোনানো হল। আসলে গণাচারি যে কোন্ পক্ষে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

রজা এবং ভেঙ্কান্না হায়দরাবাদ গিয়ে চার হাজার টাকা দিয়ে একটা পুরোন গাড়ি কিনে নিয়ে এল। নির্বাচনী প্রচারে গাড়ি লাগবে শুনে অবাক হয়ে গেল রাওয়াইয়া। কখন কোন ফাঁকে তাকে নাকি

জিজ্ঞাসাও করেছিল। সে নাকি হুঁ বলেছিল। বন্ধুর মনে পড়ে রাজা একবার চার পাঁচ হাজার টাকার কথা বলেছিল। কিন্তু সেটা যে গাড়ি কেনার জন্য তা তার ঠিক মনে পড়ছে না। এই নিয়ে যখন তর্ক হচ্ছে ঠিক তখনই ধর্মরাজু এবং লিঙ্গরাজু এল।

'তাতে কি হয়েছে বাওয়া? গাড়ির দরকার না থাকলে বিক্রি করে দেব। এনেছে যখন দুচারদিন থাক, তারপর ছেড়ে দেওয়া যাবে।' বলল ধর্মরাজু।

তবে দিন চারেক গাড়িতে করে নির্বাচনী প্রচারে বেরোনোর পর রাওয়াইয়ার বেশ মেজাজ এসে গেল। তার মনে হল গাড়ি একটা প্রয়োজন। সুযোগ বুঝে একবার বলেছিল, 'পঞ্চায়েতের নির্বাচনে গাড়ি না হলেও চলবে বাওয়া! এখন ইচ্ছে করলে ভাল দামে বিক্রি করে দিতে পার।'

'না থাক, কিনেছে যখন! নির্বাচন হয়ে গেলে, বিক্রি করা নিয়ে ভাবা যাবে'খন।' বলল রাওয়াইয়া।

অন্য পক্ষের নির্বাচনী তোড় জোড় দেখে পুন্নাইয়াও কিনে ফেলল দশটা সাইকেল। এই সময়ে কিছু না করা মানে তার পক্ষেও দুর্বল হয়ে যাওয়া। সেই সাইকেলে পিচ্‌বোর্ডের উপর কিছু কথা লিখে সাইকেল নিয়ে ছেলেদের গ্রামে ঘুরতে বলল। ঘুরবে আর প্রচার করবে। এক মাত্র রাজু বাড়ি থেকে নড়লো না। প্রচারে বেরোতে কাউকে সে বারণও করল না। সুব্বাইয়া গাঁয়ের পাঠশালায় শিক্ষকদের ডেকে পাঠাল। তাদের মাস মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। 'সুব্বাইয়া শিক্ষকদের মাথা খাচ্ছে, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ডকে উঠছে' বলে গাঁয়ের অভিভাবকদের ডেকে পাঠাল রাওয়াইয়া। শিক্ষকদের পেছনে পেছনে কিছু ছাত্রও জুটেছে। ছাত্রাবস্থায় ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে যদি দলবাজি করে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—সে বিষয়ে আশঙ্কাও প্রকাশ করল রাওয়াইয়া। এর আগে সুব্বাইয়া, পুন্নাইয়া, ভেঙ্কটেশ ও কয়েকজন দিন-মজুরের উপর যে রাওয়াইয়া ক্রিমিনাল কেস্ করে রেখেছে, তা-ও সে বৈঠকে আলোচিত

হল। এর আগে বহু লোককে রাওয়াইয়া নানাভাবে উপকার করেছে। কিন্তু তারা বিশেষ মুহূর্তে সুব্বাইয়ার দিকেই ছিল। তা ছাড়া গ্রামে রাওয়াইয়ার যতই হাঁকডাক থাক, শহরের কোর্টের লোক তার কথা যে কতখানি শুনবে সে বিষয়ে বহুলোকের মনে সন্দেহ আছে। তাই যাদের নামে রাওয়াইয়া কেস্ করেছিল তারা সোজাসুজি সুব্বাইয়ার দিকে চলে গেল। তা ছাড়া যে সব দিন-মজুররা সুব্বাইয়ার কাছে কাজ করত, ট্রাক্টর পুড়ে যাওয়ার পরে পাদ্দালুর কাছ থেকে তারা জানতে পারল যে তারা তাদের কাজ ফিরে পাবে। বহু দিন-মজুর আবার সুব্বাইয়ার দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ধর্মরাজু একদিন ওদের সবাইকে পেট ভরে তাড়ি খাইয়ে দিল। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে রাওয়াইয়ার গাড়িতে বসিয়ে শহরে ঘুরিয়ে আনল রজা ও ধর্মরাজু। তবে শহর থেকে ফেরার সময় গাঁয়ে ঢুকে নেশার ঘোরে ভেঙ্কটেশ ও পেন্টাইয়া গাড়িতে বসেই গোলমাল শুরু করে দিল। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রাইভারের উপর। তখন ড্রাইভার গাড়ির গতি ও স্টিয়ারিং আয়ত্তে রাখতে পারল না। সেই সময় গঙ্গাম্মার নেতৃত্বে একদল বাচ্চা নির্বাচনী প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। গাড়ি ডানদিক-বাঁদিক করতে করতে ওই মিছিলের মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে থেমে গেল। এই ঘটনার খবর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সেই ঘটনায় কেউ মারা যায়নি বটে, বারান্দাও যে ভেঙে চুরে গেছে তাও নয় —কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে এই ধরনের ঘটনা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়। ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো কেস্ হল, পুলিশ এলো, ডাক্তার এলো। গোটা গ্রামের আবহাওয়া আবার জটিল হয়ে উঠল। মল্লম্মার উৎসব পণ্ড হওয়ার পর অনেক দিন পরে আবার গোটা গ্রাম উত্তেজনায় গরম হয়ে গেল।

গঙ্গাম্মার ভীষণ চোট পেয়েছে। গায়ে অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজে রক্তের ছোপ। গঙ্গাম্মাকে সেই অবস্থায় খোলা গরুর গাড়িতে বসিয়ে সারা গাঁয়ে ঘোরাল পুন্নাইয়া। দুর্ঘটনার পরের দিন থেকেই সে এই ধরনের প্রচার শুরু করল। ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে

লাগল, 'আপনারা যদি ওদের ভোট দেন তবে আপনাদের এই অবস্থা হবে।' সবাই চোখ ছানাবড়া করে গঙ্গায়ার পায়ের ব্যাণ্ডেজ দেখল। গাড়িটিকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে ধর্মরাজু গাড়ি নিয়ে ফিরছিল। গঙ্গায়ার গরুর গাড়ির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল রাওয়াইয়ার গাড়ি। ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল ধর্মরাজু, পেছনের সীটে তিনজন অচেনা লোক। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িদুটো। রাওয়াইয়ার গাড়ির পেছনে ছিল তার পাড়ির লোক। সুব্বাইয়ার লোক ছিল গরুর গাড়ির পেছনে। অন্য লোকগুলো পাশ কাটিয়ে একধার দিয়ে চলে যেতে লাগল। গরুর গাড়ির সামনে লাঠি হাতে দাঁড়াল পাল্দালু।

'গরু হাঁকাবি না শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? আর অপেক্ষা করব না, ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাব।' বলল ধর্মরাজু। দেখতে দেখতে গাড়িকে ঘিরে সুব্বাইয়া কাপুর লোকজন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার ভীষণ ভয় পেল। ইতিমধ্যেই তার নামে একটা কেস হয়ে আছে। গাড়িকে ঘিরে যেভাবে ওরা দাঁড়িয়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে গাড়িটা একটু নড়লেই সে ছাতু হয়ে যাবে।

পুলিশ এল। পুলিশ ইন্সপেক্টর হুমকি দিল, 'এসব আর চলতে দেওয়া হবে না। পাইকারি হারে এ্যারেষ্ট করব। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে দেব।'

'দেখুন না স্যার, গাঁয়ের লোককে ক্ষেপিয়ে দলে টেনে এনেও হল না, এখন আবার শহর থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে এনেছে।' বলল পুন্নাইয়া গাড়ির পেছনের সীটে বসে থাকা লোক গুলোকে দেখিয়ে।

'স্যার আপনি সাক্ষী রইলেন, খারাপ কিছু ঘটে গেলে আমরা কেস করবো। পেছনের সীটে যারা বসে আছে তারা গুণ্ডা নয়। আমার রাওয়াইয়া বাওয়ার মেয়েকে দেখতে এসেছে এরা। আজ বাদে কাল যারা আত্মীয় হবে তাদের এভাবে অপমান জনক কথা বলা ভীষণ অন্যায় হচ্ছে।' বলল ধর্মরাজু।

ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে পুলিশদের দিয়ে গাড়ি দুটোকেই সেখান থেকে সরিয়ে দিল। তখনকার মত কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

'বাবারে বাবারে বাবারে বাবা, কত বড় লোকদের গাড়িতে চাপিয়েছি। সাংঘাতিক কিছু হয়ে গেলে মুখ দেখানোর উপায় থাকত না। গাড়ি গেলে আর একটা গাড়ি হবে কিন্তু মানসম্মান গেলে আর তা কেনা যায় না। কি বলব বাওয়া, জীবনটাকে যেন মুঠোয় করে এনেছি। এখন এদের কী ভাবে রাখবে না রাখবে তার দায়িত্ব তোমার। আর আমি এই বোঝা বইতে পারছি না। কি বলব, একটা গরুর গাড়িকে এনে আমাদের গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিল! আর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল পাল্লাল লাঠি হাতে। সে কী উত্তেজনা! ভাগ্যিস ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে একটার পর একটা গাড়ি পাস করে দিল। তা না হলে আজকে একটা বিরাট গোলমাল হয়ে যেত।' ধর্মরাজু এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যেন সে অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসেছে।

গাড়িতে করে কোন বড় বড় নাম করাদের যে আনা হয়েছে রাওয়াইয়া তা জানে না। 'গাড়িতে করে কাদের এনেছ?' জিজ্ঞেস করল রাওয়াইয়া।

'গোটা রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ! এতক্ষণ পরে এই প্রশ্ন? এনেছি পল্লিপাড়ু গুরবালা বাপানাইয়াদের।' বলল ধর্মরাজু।

গুরবালা বাপনাইয়ারা যে কারা এবং তাদের সম্পর্কে ধর্মরাজু যে তাকে কখন কী বলেছে তার কিছুই রাওয়াইয়ার মনে নেই। তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে রাওয়াইয়া বুঝতে পারল যে ওরা লক্ষ্মীকে দেখতে এসেছে। তার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। ব্যাপারটা গড়াতে গড়াতে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে রাজুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু লক্ষ্মীর জন্য অন্য কোথাও পাত্র খোঁজার মানসিক প্রস্তুতিও নেই। রাগটা ঘুরতে ঘুরতে ধর্মরাজুর বিরুদ্ধেই যেন কেন্দ্রীভূত হল। তারপর সেই রাগ পড়ল যারা দেখতে এসেছে তাদের উপর। মনের বিরক্তি বাইরের লোকের সামনে রাওয়াইয়া প্রকাশ করল না। ওদের প্রতি তার যা কর্তব্য তা যান্ত্রিক ভাবে করে যেতে লাগল। বৈঠকখানা ঘরে ওদের বসানোর খাওয়ানোর

সুব্যবস্থা করল। ধর্মরাজুকে এইভাবে হুট করে একটা নতুন সম্বন্ধ আনার জন্ত তার বউও যা তা বলল। সুরাজুও পছন্দ করল না অন্ত কোথায়ও তার মেয়ের বিয়ে হোক। তার ধারণা, আজ হোক, কাল হোক দুই পরিবারের ঝগড়া মিটবেই এবং লক্ষ্মী রাজুর বাড়িতে যাবে। এখনও এমন কিছু ঘটে যায়নি যে ঐ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তা ছাড়া মা হয়ে মেয়ের মন গভীর ভাবে সে বোঝে। রাজুর প্রতি মেয়ের টান যে কত বেশি, রাজুকে যে সে কতখানি ভালবাসে, তার প্রমান সে বহু ঘটনার ভেতর দিয়ে বুঝেছে।

'তুমিই তো আনতে বললে ওদের! এখন যদি এসব উল্টো পাল্টা কথা বল ওদের সামনে দাঁড়াব কি করে?' বলল রঙ্গা।

রাওয়াইয়া যতই রেগে থাকুক তার মুখের উপর সাহসের সঙ্গে কথা বলার বুকের পাটা ঐ বাড়িতে একমাত্র রঙ্গারই আছে। ভেঙ্কান্না মুখ ফুটে একটি কথাও বলল না। ধর্মরাজু তালে ছিল নিজের বক্তব্য পরিষ্কার করে রাওয়াইয়ার কাছে বলার জন্ত। একটু স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'বাওয়া, এখন যদি আমরা মেয়ে না দেখাই আমাদের সম্মান ক্ষুন্ন হবে। মেয়েকে আমরা দেখাই না কেন? তারপর সন্ধ্যের সময় গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে আসবো। পরে ধীরে সুস্থে বসে ওদের আলোচনা করে যা মন চাইবে তাই করা যাবে। ইচ্ছে না থাকলে একটা চিঠি লিখে দিলেই হয়। আর চিঠি না লিখলে আমি তো আছিই, খারাপ খবর বয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য লোক।'

মেয়েকে দেখানো মানেই বিয়ের ব্যাপারে নিমরাজী থাকা। আর এই খবর ওই বাড়িতে পৌঁছে গেলে ওদের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে—কেন রাজুকে আমাদের অপছন্দ। তার চেয়ে বড় বিপদ হল, এক্ষুনি যদি এরা মেয়ে দেখে পছন্দ করে ফেলে! লেনদেনের কথা যদি পাড়ে? আশীর্বাদের দিনক্ষণ ঠিক করতে বলে? তখন কি বলা যাবে যে আমরা মেয়ে দেখিয়েছি বটে কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেব না? এই ধরনের প্রশ্ন রাওয়াইয়ার মগজে গিজ্ গিজ্ করতে থাকে।

এত কথা হচ্ছে যে লক্ষ্মীর কানেও কিছু কিছু কথা যাচ্ছে কিন্তু তার

ঘোরাফেরা দেখে মনে হয় যেন এসব ব্যাপার তার বিষয়ে নয়। সেদিন রাজুর সঙ্গে কথা বলে তার যে ধারণা হল তা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। সেই থেকেই তার মন ভেঙে গেছে। সে ভেবেছিল রাজু এ সমস্ত ঝামেলার ঊর্দ্ধে তাদের ভালবাসাকে স্থান দেয়। সমস্ত সমস্যার সমাধান সে এগিয়ে এসে করবে। পরিবেশ খারাপ হয়ে গেলে সে ভাল করবে। ঝামেলা মেটাবে। কিন্তু রাজুও আর পাঁচজনের মতই কথা বলল। রঙ্গা, তার দাদা ওদের বাড়ির লোক সম্পর্কে যে ধরনের কথা বলে রাজুও তার পরিবারের লোক সম্বন্ধে ঠিক সেই ধরনের কথাই যেন বলল। গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে বিরক্তি আর অনাস্থা জেগেছে লক্ষ্মীর মনে।

অন্যদিকে রাওয়াইয়া কি করবে ঠিক করতে না পেরে সোজা মেয়ের কাছেই এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি করা যায় মা এখন?'

'তোমার যা ইচ্ছে কর।' মেয়ে যদি একথা বলত তাহলে যে রাওয়াইয়া কি করত তা সে নিজেও জানে না। কিন্তু লক্ষ্মী অনেকক্ষণ ভেবে বলল, 'ওদের যখন ডেকে এনেছ না দেখিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলে কি ভাল দেখাবে?'

'এই তো, বোনের ইচ্ছে আছে।' রঙ্গা বলল।

তবু রাওয়াইয়া ঠিক করতে পারল না কি করবে। মেয়েকে দেখালেই তো সেই খবর ছড়িয়ে পড়বে। তার মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বহু প্রশ্ন জট পাকাতে লাগল। মান মর্যাদাকে রাওয়াইয়া চিরকাল ঊর্দ্ধে রেখে এসেছে। যারা তার মেয়েকে দেখতে এসেছে, তাদের ধারণা রাওয়াইয়া আগ্রহ ভরে তাদের ডাকিয়ে এনেছে। ধর্ম-রাজুর কথা ও আচরণের ফলই তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। যতই হোক লক্ষ্মী তারই মেয়ে। ওদের যদি পছন্দ হয়, মেয়ে যদি রাজী থাকে, বিয়ে হবে!

রাওয়াইয়া মেয়ের দিকে একবার তাকাল। মেয়ের মুখ যেন পাথরে খোদাই করা। নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ। বাবা যখন তার দিকে তাকাচ্ছিল মেয়ে তখন মাথা নিচু করেনি। মেয়ের চোখের গভীরে কি এক যন্ত্রণার

ছাপ লক্ষ্য করল রাওয়াইয়া। মেয়ে কি যেন চেপে যাচ্ছে। ওর সেই কঠিন মুখের দিকে ত কিয়ে রাওয়াইয়ার মনে ক্রমশ রাগ হতে লাগল। সে বলল, 'বিকেল তিনটের সময় ওরা দেখবে। ভাল শাড়ি পরিয়ে বেনী বেঁধে দেবে।' বউমা ও স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রাওয়াইয়া বলল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে গেল। সুরালুর ভীষণ ইচ্ছে করল তাকে একটু আদর করতে। সে কাঁদলে তার সাথে একটু কাঁদতে। তার পেছনে পেছনে যেতে। কিন্তু মেয়ে এমন এক কঠিন গম্ভীর ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল যে সুরালু তার পেছনে যেতে ঠিক মেজাজ পেল না। সাহস ও হল না তার।

রাজু দীঘির পাড়ে ট্রাক্টর দাঁড় করিয়ে একজন মেকানিক দিয়ে সারাচ্ছে। ক্ষেতের মাটি তপ্ত রোদে ফুটি ফাটা হয়ে গেছে। মাটির ঢেলা যেন লোহার পিণ্ড। ফাটা মাটির গভীরে অন্ধকার লুকিয়ে থাকে মানুষের মনে যেভাবে অন্ধকার জমে থাকে। মাটির সেই ফাটা জায়গাগুলোর ভেতরের দিকে তাকিয়ে রাজু কি যেন ভাবছে। বৃষ্টিতে যে মাটি অত নরম হয়ে যায় তার এই কঠিন রূপ দেখে রাজুর অবাক লাগে। অথচ কি বর্ষায়, কি রৌদ্রের খরতাপে মাটির গভীরে সাপ ঠিক নিজের বাসা করে নেয়। ভাবতে ভাবতে সে হঠাৎ দেখতে পেল একটি সাপ। রাজু সাপটিকে দেখতে পেয়েছে কিন্তু সাপ তাকে দেখতে পায়নি। খুব কাছে যখন গেল তখন সে রাজুকে দেখতে পেয়েছে, চোখ দিয়ে নয়, শরীরের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে। সাপ থামিয়ে দিল তার চলা। কিছুক্ষণ সাপটি মেরে থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল। ক্ষেত থেকে বেরিয়ে দীঘির ঘাটে উঠে বিশেষ কাজের তাড়া থাকার মত নেমে গেল জলে। মাটির উপর তার চলা আর জলের উপর দিয়ে যাওয়ার মধ্যে রাজু কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না। এ যেন রাজুর কাছে একটা আবিষ্কার। সাপ জলে স্থলে এত সাবলীল ভাবে চলাফেরা করতে পারে!

টর্‌র্‌-টর্‌র্‌-টর্‌র্‌। ট্রাক্টরের শব্দ। রাজু তার দিকে একবার তাকাল। ট্রাক্টরটাকে সারিয়ে মেকানিক ক্ষেতের উপর কিছুক্ষণ চালাল।

লোহার মত কঠিন মাটির বুক চিরে ট্রাক্টর এগোতে লাগল। তার চলা দেখে মনেই হচ্ছে না যে তার কোন অসুবিধে হচ্ছে। মেকানিকের হাতের কাছে সে যেন দাসানুদাসের মত মাথা গুটিয়ে রয়েছে।

সাপ মাটির উপর চলা ভালবাসে। মাটির গভীরে সে থাকতে ভালবাসে। আর ট্রাক্টর মাটি উপড়াতে। আর মানুষ? মানুষ কি হারিয়ে ফেলেছে মাটির গভীরে থাকার বুদ্ধি ও মাটি উপড়ানোর শক্তি? শক্ত মাটি যন্ত্র ভাঙতে পারে, নরম করতে পারে আর মানুষ কি কোনদিন পারবে না শক্ত মন নরম করতে?

রাজু বাড়িতে পৌঁছে দেখল লোকজন জমে রয়েছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে তার বৌদি সুন্দরাম্মা কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। সুব্বাইয়া আরাম কেদারায় বসে রয়েছে। পরিবেশ দেখে মনে হয় সবাই গুরুত্ব-পূর্ণ কিছু একটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। একমাত্র পুন্নাইয়া বারান্দায় দ্রুত পায়চারি করছে। খুব অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। গঙ্গাপ্পার মুখে কথা নেই। কি যেন ভাবছে সে। একটা লাঠি চিবুকে ঠেস দিয়ে ঠায় সে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের বারান্দায় স্বজন হারানোর দুঃখে যেন সেবাম্মা বসে রয়েছে। সে যেন ভেঙে পড়েছে। পাদ্দালু সদর দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দিকে গরুর জাব দিতে দিতে মল্লি এমন ভাবে চলাফেরা করছে যেন এসব কিছুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। পুন্নাইয়া হাত পা নেড়ে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের ভূমিকাকে সঠিক নয় বলে, জনসঙ্ঘের সভার মত, জোরে জোরে কি যেন বলছে।

'তুমি জানতে না যে ওরা কি রকম লোক? তুমি এদিকে বসে আছ ওরা ওদিকে কাজ সেরে নিয়েছে। বাওয়া বাওয়া বলে ওরা যা বলেছে তাই করেছ। যেদিকে দেখতে বলত সেদিকেই দেখতে। ও আমাদের চেয়ে কোন্ বিষয়ে বেশি বোঝে? গাঁয়ে ও যেভাবে নাচাতো সেই ভাবেই নাচা হত, যেভাবে গাওয়াত সেই ভাবেই গাওয়া হত। তোমার ভদ্র নম্র ব্যবহারটাই সমস্ত অনিষ্টের মূল।' পুন্নাইয়া বলল।

সুব্বাইয়া ছেলের মতই জোরে জোরে বলল, 'তা আমাকে কি করতে

বলিস ? ওই গাড়িটাকে আটকে রাখব ? যারা গাড়িতে করে এসেছে তাদের কি ··' তারপর আর বলতে পারল না সুব্বাইয়া।

'যারা এসেছে তাদের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক ? এই সম্বন্ধ যে ভেঙ্গে যাচ্ছে সেটা তো মন্নম্মার উৎসব ভাঙ্গার দিনেই বোঝা গিয়েছিল। ইতিমধ্যে রাজুর জন্য অন্য কোথাও মেয়ে দেখা উচিত ছিল। তা করলে আমরা এ ব্যাপারে এগিয়ে থাকতাম। আমাদের আগে ওরা অন্য জায়গায় পাত্র খুঁজে নিয়েছে—এ কথাটা ছড়িয়ে পড়লে গাঁয়ে আর আমাদের মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।'

রাজু ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝল। যা বুঝল তা সঠিক কিনা যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করল।

'লক্ষ্মীর জন্য আলাদা পাত্র খুঁজছে।' বলল গঙ্গাম্মা।

'খুঁজছে কি রে ? ধর্মরাজু প্রকাশ্যে বলছে যে মেয়ে ভালো শাড়ি পরে সেজে গুজে বসেছিল। বিশ্বাস না হয়, যাও এখনও শুনে আসতে পার দীঘির পাড়ে ধর্মরাজু কি বলছে।' বলল পুন্নাইয়া।

'ওদের যা ইচ্ছে করুক, আমাদের অতো মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' বলল রাজু।

'লজ্জা করেনা তোর এই কথা বলতে ? ঐ মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক। আশীর্বাদ হয়ে গেছে। মায়ের কাছে পাঁঠাবলি পর্যন্ত হয়ে গেছে। লোককে পান সুপুরি দিয়ে জানানোও হয়ে গেছে। এরপর যদি বিয়ে না হয় তাহলে গাঁয়ে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে ? আমাদের খবর না দিয়ে, অনুমতি না নিয়ে কোন সাহসে ওরা অন্য জায়গায় সম্বন্ধ করতে সাহস পায় ? ওরা নাকি আবার গাঁয়ের মাথা ! মাথা না ছাই !'

'ওরে বাবা রাজু, শোন, যাই ঘটুক না কেন ঐ মেয়ের বিয়ের আগে তোমার যেন বিয়ে হয়ে যায়। এটাই আমি চাই।' আরামকেদারা থেকে উঠতে উঠতে সুব্বাইয়া বলল।

'এই হল আসল কথা। আমিও তাই চাই।' বলল পুন্নাইয়া।

'ওর কিসের অভাব পড়েছে ? কেন মেয়েকে আমার ছেলের সাথে

বিয়ে দেবে না ? আমি নিজে গিয়ে রাওয়াইয়াদাকে জিজ্ঞেস করব না একবার ?' শেষাম্মা বলল।

'তোমার আর জিজ্ঞেস করতে হবে না ! খুঁজলে রাত ভোর হওয়ার আগেই একটা ভাল পাত্রী পেয়ে যাব।' বলল পুন্নাইয়া।

এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল সুন্দরাম্মা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'অন্য জায়গায় অত খোঁজাখুঁজির দরকার কি ? আমার খুড়তুতো বোনের সঙ্গে রাজুর বিয়ের কথা ওরা তো অনেক আগেই বলেছিল ! আর সে তো যে সে মেয়ে নয়, যেন কাঁচা সোনায় তৈরি প্রতিমা। যেমন রঙ তেমনি তার গড়ন। বাপের একমাত্র মেয়ে। মেয়ের নামে একশ একর জমি আছে। কাকের মুখে খবর পাঠালেও ওরা আগ্রহ করে চলে আসবে।'

'কি, তুমি তো মেয়েটাকে দেখেছ, কি বলবে বল !' বলল সুব্বাইয়া।

'কথা তো আর শুধু মেয়ের ব্যাপারে নয়, মেয়ে নিশ্চয় সুন্দরী হবে।' বলল শেষাম্মা।

'মেয়ের নিজেরই তো ছশো ভরি সোনার গয়না আছে !' সাগ্রহে বলল সুন্দরাম্মা।

'কি রে, গুড়ের হাঁড়ির মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? হ্যাঁ না, কিছু বলবি তো ?' বলল পুন্নাইয়া।

'একশ একর জমি আর ছশো ভরি সোনা পণ না পেলে কি আমরা ভিক্ষে করে খাব ?' বলল রাজু।

'পণের কথা কে বলছে ? একটা ভাল মেয়ে আছে সন্ধানে সে কথাই তোমাকে তোমার বৌদি জানিয়েছে।' বলল পুন্নাইয়া।

'ওই ধন সম্পত্তি নিয়ে যে মেয়ে আসবে তাকে চাইনা। কোন ভাবেই আমি পণ নেবো না।' বলল রাজু।

'ঠাকুরপো এখনও লক্ষ্মীর উপর আশা ছাড়ে নি।' বলল সুন্দরাম্মা।

'আমার কোন আশা নেই। ভরসাও নেই। আমার এখন বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে না। এটাই সত্য।' রাজু বৌদির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

'কেন ইচ্ছে করছে না ?' পুন্নাইয়ার প্রশ্ন।

'দেখ রাজু, তোমার বিয়ের আগে যদি ওই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, তাতে কি আমাদের মান সম্মান থাকবে ?' সুব্বাইয়া তাকে সরাসরি প্রশ্ন করল।

'তাই বলে আমার ইচ্ছে না করলেও বিয়ে করতে বলছ ?' দৃঢ় কণ্ঠে রাজু জবাব দিল।

'হ্যাঁ রে বাবা, বিয়ে না করে কি তুই সন্ন্যাসী হবি ?' শেষাম্মা বলল।

'সে কথা তো বলছি না, আমার যখন ইচ্ছে হবে, বিয়ে করব !' রাজু সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'ওর ইচ্ছেটাই বড় হল ! আমাদের বংশের গৌরব, আত্মসম্মান, মান মর্যাদা ওসব রক্ষা করার দায়িত্ব রাজুর নেই !' পুন্নাইয়া হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল।

'এ সব আজে বাজে কথা বাদ দিয়ে, শেষ কথা, একটা কিছু, বললেই তো চুকে যায়। পণ চাও না, সোনা চাও না তা এসব ছাড়া কোন্ মেয়ে তোমার বউ হয়ে আসবে আমাদের তা জানিয়ে দাও—আমরা তার সাথেই তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। আমি শুধু চাই, রাওয়াইয়ার মেয়ের বিয়ের আগে যেন তোমার বিয়ে অবশ্যই হয়।' বলল সুব্বাইয়া।

রাজু কিছুক্ষণ কথা বলল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। যেখানে একটু অন্ধকার ছিল সেখানে তা আরও বাড়ছে। রাজুর কপালের শিরা উপশিরা গুলো যেন যন্ত্রণায় লাফাচ্ছে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। পরিবারের লোকের উপর, গাঁয়ের উপর, আত্মীয়স্বজনদের উপর, যারা তার আশপাশে রয়েছে তাদের উপর—গোটা পরিবেশের উপর তার সীমাহীন বিরক্তি জাগল। উত্তরের দিকে মল্লি আপন মনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এদের সকলের কথাও সে শুনতে পাচ্ছে। কথা শোনার তার কোন আগ্রহ নেই। কথাগুলোই, আপন গতিতে, তার কানে ঢুকছে। রাজু একবার মল্লির দিকে তাকাল। মল্লি ব্যস্ত ছিল গরু বাছুর নিয়ে। ঐ গোটা পরিবেশের মধ্যে মল্লিকেই ভিন্ন ধরনের মনে হল রাজুর। হঠাৎ দৃঢ়তার

সঙ্গে সে বলল, 'তোমরা তাহলে চাও যে ও-বাড়ির মেয়ের বিয়ের আগে আমার বিয়ে হোক, এই তো? তা মেয়ের জন্য অত জায়গায় খোঁজা-খুঁজি করার দরকার কি? আমি যে ধরনের মেয়ে চাই, সে তো বাড়িতেই আছে। আমি মল্লির কথা বলছি।'

'মল্লি?' নিজের কানকে অবিশ্বাস করার মত চোখ ছানাবড়া করে সুন্দরাম্মা জিজ্ঞেস করল।

সবাই হাঁ করে রাজুর দিকে তাকাল। গঙ্গাম্মার কিছুক্ষণ দম বন্ধ হয়ে গেল। আনন্দে না বিস্ময়ে তা সে নিজেই জানে না।

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?' বলল পুন্নাইয়া।

'তোমরা আমার বিয়ে হোক এটাই চাও তো?' বলল রাজু। কারও মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ এভাবে যে মল্লির নাম উঠবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর অবস্থার পরে রাজুর কথাগুলো হজম করেই যেন সুব্বাইয়া বলল, 'ও এমন কি খারাপ কথা বলেছে? মেয়ে হিসেবে মল্লি তো খারাপ নয়!'

হঠাৎ মল্লির মনে পড়ে গেল সেই চিঠির তাড়ার কথা। সে এক দৌড়ে চলে গেল গোয়ালে। তাকে দেখেই গরুগুলো ডাকতে লাগল। ঐ মূক জন্তুদের সঙ্গে মল্লির যেন অনেক কথা হয়ে গেল। রাজু বাওয়ার সিদ্ধান্ত তার যে কি রকম লেগেছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না। তার মনের ভেতরে ছোট্ট একটু অন্ধকার দানা বেঁধে উঠল। কার কাছে যাবে, কাকে বলবে, কে শুনবে তার কথা? এতদিন কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে রাজু বাওয়াকেই সে জিজ্ঞেস করত। কিন্তু এখন রাজু বাওয়া যা বলল তা নিয়ে তার কাছে যায় কি করে। বিয়ে হলেই তো রাজু বাওয়া খুব কাছের মানুষ হয়ে যাবে। ও যত কাছের হবে ততই তার মন দূরে সরে যাবে। এখনই সরে গেছে কিনা কে জানে। এই বিয়ের ব্যাপারে মল্লির মনে আশা আছে, নিরাশাও আছে। ভয় আছে, সাহসও যে নেই তা নয়। এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে মল্লি মাথা নিচু করে এক কোণে বসে রইল। কতক্ষণ বসে ছিল তা সে জানে না। সুন্দরাম্মা খেতে ডাকলে সে উঠল।

পঞ্চায়েতের নির্বাচনের আর মাত্র দুদিন বাকি। এই নির্বাচনী জ্বরে ভুগছে কয়েকজন। গ্রামে কালেক্টর এসে গেছে। গ্রামের অবস্থা দেখে তার মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। যারাই তাকে ডাকে, নিমন্ত্রণ করে, তাদেরই সে নিরাশ করে। কারও বাড়িতে যায়নি সে। তার ভয় পাছে কারও বাড়িতে গেলে তার পক্ষপাতিত্বের কথা প্রচার হয়ে যায়। সে যে নির্বাচনের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তা প্রমাণ করতে চায়। তা-ই বলে কারও সাথে আলোচনা না করলে তো চলবে না। এ জন্য সে চেষ্টা করল দু পক্ষকে এক জায়গায় বসিয়ে আলোচনা করতে। দু পক্ষকেই শাসিয়ে বলল কোন গোলমাল যেন না হয়। গোলমাল হলেই পুলিশ দিয়ে ছেয়ে ফেলবে। তার উদ্যোগে একটা সভা হল। গ্রামের বয়স্কদের ডাকা হল। নির্বাচনে যারা আগ্রহী তারাও এল। আর এল দু পক্ষের স্বেচ্ছাসেবক। পঞ্চায়েত করার উদ্দেশ্য থেকে নির্বাচনের তাৎপর্য এবং এ ব্যাপারে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে অন্যদের বলতে বলে সে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার উঠে জানিয়ে দিল সরকার চায় যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবে হোক।

কালেক্টরের বয়স কম। কথাগুলো বড্ড কাটা কাটা। কোন রস কষ নেই। নম্রভাব নেই। সরকারের পক্ষ থেকে সে যে এসেছে তা যেন সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না। তার বক্তব্যে নির্দেশ আছে, ধমকও আছে।

তার এই আচরণ রাওয়াইয়া ও সুব্বাইয়ার কাছে ভাল লাগল না। কালেক্টর ছোকরাটা যেন পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। আর ওরা যেন তার ছাত্র। এর আগে কোন কালেক্টর এই ধরনের আচরণ দেখায়নি। বয়স্করা বুঝতে পারল ছোকরাটির অভিজ্ঞতা কম।

'আমাদের এই সব কথা বলতে হবে না। আপনি আপনার ডিউটি করে যান।' বলল রাওয়াইয়া।

মুহূর্তকাল কালেক্টর ভেবে পেলনা এই কথার পিঠে কি বলা উচিত। তারপর সে বলল, 'আমি আমার কর্তব্য বুঝি। আমি আবার বলছি, গ্রামে শান্তি বজায় রাখবেন। এখনও আমি যদি মনে করি যে

নির্বাচন করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়নি, অশান্তি আছে, তাহলে কিন্তু নির্বাচন বন্ধ করে দেব।'

'তাহলে কি হবে?' রাওয়াইয়া জিজ্ঞেস করল।

'নির্বাচন পেছিয়ে দেব।'

'শুধু একজনের ইচ্ছেতেই তো নির্বাচন পেছিয়ে যাবে না?' ক্ষুব্ধ হয়ে সুব্বাইয়া বলল।

'মুন্সেফের হাতে ক্ষমতা আছে নির্বাচন পেছিয়ে দেওয়ার। আমি যা বলব মুন্সেফ তাই করবেন। নির্বাচন করতে বললে করবেন।' পুন্নাইয়া বলল।

'অত ঘুরিয়ে কি বলছ শুনি? তোমরা কি ভেবেছ আমরা কালেক্টরকে ঘুষ দিয়েছি?' বলল রঙ্গা।

'ওসব তোমরা জান আর উনি জানেন।' বলল সুব্বাইয়া।

'যাই ঘটুক, নির্বাচন হবে। নির্বাচন করতে হবে।' রাওয়াইয়া আবার বলল।

এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় হঠাৎ রাজু দাঁড়িয়ে বলল, 'কালেক্টর মশাই, আপনার আশঙ্কা অমূলক নয়। নির্বাচন হলে গোলমাল হবেই। কিছু রক্তপাত হবেই মনে হচ্ছে। এখন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়াই ভাল।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' বলল পুন্নাইয়া।

'ওর দোষ নেই। বুঝতে পারছে যে হেরে যাবে সেইজন্যই বলা।' ধর্মরাজু বলল।

কথার পিঠে কথা ওঠে। সবাই মুখ খুলল। সবার কথা এক সঙ্গে শোনা গেল। ফলে কোন কথা বোঝা গেল না। কালেক্টর, চুপচাপ লক্ষ্য করতে লাগল। তার পাশে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর, কয়েকজন পুলিশ। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে রাজু ও কালেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করল। বলতে বলল। 'ওঁর বক্তব্য উনি বলেছেন। তাই নিয়ে এত হৈ চৈ, চেঁচামেচি করার কি আছে? কালেক্টর মশাই, আমার একটি প্রস্তাব আছে। আপাতত নির্বাচন পিছিয়ে দিলেও

অন্তর্বর্তীকালীন পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট পদে রাওয়াইয়া মশাইকে রাখুন। আশা করি, আমার এই প্রস্তাবে কারও আপত্তি থাকবে না। রাজু এই কথা বলে সেখান থেকে সোজা চলে গেল।

পরক্ষণেই সভা শেষ হয়ে সমস্ত পরিবেশ কেমন থমথমে হয়ে গেল। নির্বাচন বাবদ দুপক্ষেরই যে টাকা খরচ হয়েছে তা জলে গেল। রাজু যে কেন এই ধরনের প্রস্তাব করল রাওয়াইয়া কিছুতেই তা বুঝতে পারল না। একি তার প্রতি শ্রদ্ধাবশত? এ ব্যাপারে ভেঙ্কান্না ও ধর্মরাজু যে যার মত প্রকাশ করল।

সকলের সামনে রাজু এই প্রস্তাব রাখল বটে, আর রাজুর এই প্রস্তাবের ফলে সেই কালেক্টরকেও কিছুটা হাত করতে পারল। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপনে নির্বাচন পেছিয়ে দেওয়া।' বলল ভেঙ্কান্না।

'অত সহজে ওদের কথায় নত হওয়ার পাত্র কালেক্টর নয়। আসলে রাজুর একটা পরিকল্পনা ছিল। এখন যদি নির্বাচন হয়, জয় হবে কার? আমাদের? তাহলে আর নির্বাচন চেয়ে লাভ কি? তাই রাজু চায় এখন রাওয়াইয়া বাওয়া প্রেসিডেন্ট হোক। এরপর প্রত্যেকদিন তার কাজে বাধা দেবে। গোপনে এমন কিছু করবে যাতে গ্রামের কোন উন্নতি না হয়। ফলে গাঁয়ের লোক আমার রাওয়াইয়া বাওয়ার উপর ক্ষেপে যাবে। তখন নির্বাচন করাতে চায় রাজু। ও দেখতে অমন, আসলে ওর পেটে পেটে বুদ্ধি!' বলল ধর্মরাজু।

দুজনের কথায় রাওয়াইয়ার মনে ধরল না। ওরা যা বলছে তা তার কাছে সত্যি বলে মনে হচ্ছে না। রাজু ঠিক অত প্যাঁচপ্যাঁচ জানে না। সে যা বলে তা তার মনের কথাই! তাহলে কি রাজু মনে করে যে সেই এই গ্রামের প্রেসিডেন্ট হওয়ার উপযুক্ত লোক? ভাবতে ভাবতে সে ঐ পরিবেশ থেকে উঠে বেরিয়ে গেল।

মল্লি মন্দিরের পেছনে অনেকগুলো কনকে ফুলের গাছের মাঝে বসল। কাগজ পেন্সিল হাতে নিয়ে। বাওয়াকে চিঠি লিখবে। কি লিখবে ভেবে পাচ্ছে না। তবে একটা কিছু লিখতে হবে। না লিখলে

তাও হজম হবে না। ঘুম আসবে না। একটি কলকে ফুল তার পায়ে ঝরে পড়ল। কলকে ফুলের মধু মল্লির খুব ভাল লাগে। জলের মত তরল মধু। অথচ মধুর মতো ঘন মিষ্টি নয়। মল্লির জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার কলকে ফুলের মধু সে খেয়েছে। ফুলের পেছনে কি মসৃণ একটি নল। নলটা জিভে রেখে মধু টানত। সেই মধু টানার সময় চোখ বুঁজে ফেলত। আজকেও একটার পর একটা ফুল তুলে কি যেন ভাবতে ভাবতে মধু টেনে নিচ্ছিল অনেকগুলো ফুলের। মাঝে মাঝে আবার দেখে নলটা। ওই নলেতেই পোকা থাকে। চিঠি লিখল বাওয়াকে—'কলকে ফুলের মধু আমার ভীষণ ভাল লাগে। তবে ওর মধ্যে পোকা থাকে।'

এই কথাটা লেখার পর তার মন শান্ত হল। তার এতবড় একটা আবিষ্কার বাওয়াকে না জানিয়ে পারে? এ ছাড়া আর তো কোন কথা নেই তার। প্রত্যেকটা ফুলেই মধু থাকে। পোকাও থাকে।

'মল্লি' ডাক শুনে হকচকিয়ে গেল সে। চুরি করার মত সে চিঠির খাম বুকের মধ্যে গুঁজে নিল। লক্ষ্মী মন্দিরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল। পায়রার মত যেন উড়ে এল মল্লি। লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তার গলা শুকিয়ে গেছে। সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে। নিজের গলা নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকল মল্লির।

'তোমার জন্য নাকি আলাদা একটা পাত্র খোঁজা হয়ে গেছে?'

লক্ষ্মী মাথা নেড়ে সায় দিল।

'বাওয়া নাকি আমাকে বিয়ে করবে!' বলল মল্লি।

'শুনেছি!' লক্ষ্মী বলল।

আর দাঁড়াতে পারল না মল্লি। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন উড়ে গেল। আগের মতই দুটো হাত ডানার মত নাড়তে নাড়তে। অদূরে মন্দিরের সামনে রাওয়াইয়া দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করল মল্লি আর লক্ষ্মীর মধ্যে কথা হচ্ছে। দু-একটি কথা তার কানেও গেল। লক্ষ্মী ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে তার বাবা। বাপের সামনে মুহূর্তকাল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ভাবল। সে কোথায় যায়, দেখার জন্যই কি বাবা এসেছে?

মাথা তুলে বাপের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই চলে গেল। তার সেই চাউনি দেখে রাওয়াইয়ার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। খাঁ খাঁ করে উঠল তার বুক। বাবা আর মেয়ের মধ্যে যেন ফাটল ধরে গেছে। আগে যে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রাওয়াইয়ার মন শান্তিতে ভরে যেত, মন্দিরের মণ্ডপে বসেও শান্তি পেত, আজ যেন-সেই শান্তি উবে গেছে। মেয়েকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সে আসেনি। সে জানে যে মেয়ে প্রত্যেকদিন মন্দিরে আসে। এ সব কথা তো মেয়েকে খুলে বলা যায় না! বলেও নি রাওয়াইয়া। লক্ষীও বুঝতে পারেনি। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। গণাচারি প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে তার কাছে এল। ভক্তি ভরে প্রসাদ নিয়ে তার ইচ্ছে করল গণাচারির সঙ্গে মেয়ের ব্যাপারে আলোচনা করা। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল রাওয়াইয়া।

ক্ষেতে কড়াইশুঁটি ভরে রয়েছে। আম বাগানে গাছে গাছে মুকুলের বাহার। লাল পিঁপড়েগুলো সারি বেঁধে উঠছে গাছে। গঙ্গাম্মার মন কেন জানি 'রাবি' 'রাবি' করছে। কি যে তার মনের কথা তা সে গুছিয়ে উঠতে পারছে না। রাবিকে ঐ কথা সে বলবে কি করে। ভীষণ অন্যমনস্কভাবে ভাবছে আর ভাবছে। পেছন দিক থেকে পা টিপে টিপে এসে রাজু তার পিঠে চাপড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে বাওয়া বলার পরিবর্তে গঙ্গাম্মা বলল, 'রাবি।' পরক্ষণেই রাজুর দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল। রাজু হো হো করে হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে যেন আমগাছের কিছু মুকুল ঝরে পড়ল।

অদূরে দীঘির পাড়ে বসে রয়েছে মল্লি। পেছন দিক দিয়ে রাজু লক্ষ্য করল মল্লির পিঠ কাঁপছে। তার মনে হল মল্লি হয়ত তাকে দেখে ফেলেছে। ওকে বিয়ে করার কথা বলার পর থেকে ও যেন একটু বেশি লজ্জা পাচ্ছে। এড়িয়ে এড়িয়ে থাকছে। সেদিন থেকে মল্লি তার সামনে আসছে না। রাজু আস্তে আস্তে পা ফেলে মল্লির পেছনে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। মল্লি শিউরে উঠল। অবাক হয়ে গেল সে। তার জীবনে, তার বাওয়া, এই প্রথম পেছন দিক থেকে এসে তার গায়ে হাত

রাজল। বাওরা যে এই ধরনের কিছু করবে, করতে পারে তা সে কোনদিন ভাবেনি। মুহূর্তে তার চোখ জলে ভরে গেল। সেই জল গড়াতে গড়াতে গাল ভিজিয়ে মাটিতে পড়ল। মাটির বুকে মল্লির ফোঁটা ফোঁটা জল। মল্লির এই রূপ রাজু কোনদিন দেখেনি। মল্লির যে কি হল, ভেবে পেল না সে।

'মল্লি, কি হয়েছে তোমার ?'

মল্লি কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল, 'বাওরা, তোমার পায়ে পড়ছি, আমার গলায় মঙ্গলসূত্র বেঁধো না।' তারপর আর মল্লি কিছু বলতে পারলো না। জলে চোখ দুটো তার ভরে গেল। এই প্রথম মল্লি না ছুটে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল।

রাজু ঠিক বুঝতে পারল না কি ব্যাপার। তার কান্না—তার কথা—সবই দুর্বোধ্য ঠেকল তার কাছে।

মল্লি টলতে টলতে এসে রাবির উপর পড়ে গেল।

'কি হয়েছে মল্লম্মা ? কি হয়েছে ?' বলল রাবি।

'কি হয়েছে বোন ?' গঙ্গাপ্পা ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দাদা, আমি এ বিয়ে চাইনা।' বলল মল্লি।

'তোর মাথা খারাপ হয়েছে ?' গঙ্গাপ্পা বলল।

'মাথা খারাপ হয়েছে ছোটবাবুর। মন পড়ে রয়েছে লক্ষ্মীর উপর আর ঘর করতে চায় মল্লম্মাকে নিয়ে। বিয়ের পরের দিন থেকেই ওদের অশান্তি হবে। মল্লম্মার জীবনে আর সুখ আসবে না। নয় ছয় হলেও, ছোটকর্তা জীবনে লক্ষ্মীকে ভুলতে পারবে ?' রাবি বলল।

গঙ্গাপ্পা হাঁ করে শুনল রাবির কথা। ক্রমশ তার চোখ মুখের অবস্থা উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাতে লাগল।

'ওদের ঝাল ঝাড়তে চায় মল্লম্মার উপর। ওদের তো কিছু করার মুরোদ নেই। হাতের কাছে পেয়েছে মল্লম্মাকে, যা ইচ্ছে তাই করবে।' রাবি তার কথা শেষ করল।

মুহূর্তে গঙ্গাপ্পা যেন বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল। কি একটা অঘটন ঘটাতে যাচ্ছে ভেবে রাবি তার পিছু নিল।

'ছোট কাপু, ছোট কাপু।' ডাকল রাবি। মল্লি কোন কথা বলল না। দাদার পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে যেতে লাগল সে। এই প্রথম গঙ্গাপ্পা সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

রাজু একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গঙ্গাপ্পা দূর থেকে কি যেন বলল। বলা তো নয় যেন ঢিল ছোঁড়া। তার মনে যেন লাভা ফুটছে। রাজুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার বোন কি ভেসে এসেছে? তোমরা দুই বড় পরিবারে ঝগড়া করবে আর সেই ঝাল ঝাড়বে আমার বোনের উপর? কেন তাদের উপর ঝাড়তে পার না? যে বিয়েতে তোমার ইচ্ছে নেই, সে বিয়ে তুমি করছ কেন? কেন তার জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছ?' হাতের লাঠিটা তুলে আবার বলল গঙ্গাপ্পা, 'তোমাকে সোজা কথা বলে দিচ্ছি, আমার বোনের গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধতে পারবে না…।' তার হাতের লাঠিটা কাঁপতে লাগল।

'দাদা!' বলে মল্লি গঙ্গাপ্পার হাত ধরে ফেলল। রাবি এগিয়ে তার হাত থেকে লাঠিটা টান মেরে কেড়ে নিল।

'গঙ্গাপ্পা!' রাজু আশ্চর্য হয়ে বলল। গঙ্গাপ্পার রাগ দুঃখে রূপান্তরিত হল। অতবড় দেহধারী বাচ্চা ছেলের মত হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। রাজুর মন কেমন যেন ভার হয়ে গেল।

'যদি পুরুষ মানুষ হও—সোজা রাওয়াইয়ার বাড়িতে গিয়ে, ওদের মুখের উপর জিজ্ঞেস কর। পাকা কথা হয়ে গেল, পান সুপারির আদান প্রদান হয়ে গেল, কাপড় বদল হল—এখন কোন ক্রমেই লক্ষ্মীকে অন্যত্র দেওয়া চলবে না। আমার সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। মুরোদ থাকলে সোজা গিয়ে একথা বলতে পারনা?' গঙ্গাপ্পা বলল।

রাগ কান্না অনুযোগের পর গঙ্গাপ্পা যা বলল তা শুনে রাজুর মনে হল না যে কথাগুলো গঙ্গাপ্পার। কথা বলার সময় গঙ্গাপ্পাকে তার পরিচিত গঙ্গাপ্পার মত লাগছিল না।

'এত ভাল উপদেশ এর আগে তো আমাকে কেউ দেয়নি গঙ্গাম্মা।' রাজুকে কেমন যেন কঠোর দেখাল। হঠাৎ সে হাঁটতে শুরু করল।

'ছোট মহাজন, কোথায় যাও?' রাবি বলল।

'না বাওয়া, ওদের বাড়িতে যেওনা।' মল্লি বলল।

'কোন ভয় নেই। আমার পেছনে কাউকে আসতে হবে না। আমি যে যাচ্ছি সে খবর কাউকে দিতে হবে না।' বলে রাজু পা চালিয়ে চলে গেল। বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক শুনছিল এতক্ষণ। সে টেনে ছুট দিল।

রাবির নজরে পড়ল সেটা। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে রাবিও ছুটল। মল্লি ও গঙ্গাম্মা তাকে অনুসরণ করল।

রাস্তার দুধারে বাড়ি। রাজুকে ওভাবে দ্রুত গতিতে হাঁটতে দেখে দুপাশের বাড়ির লোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে গেল। রাজুর রাওয়াইয়ার বাড়িতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সেখানে রাওয়াইয়ার বহু লোক জুটে গেছে। বালকনিতে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্মী। সোজা সদর দরজায় এসে রাজু বলল, 'মামার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

'এখানে তোমার মামা-টামা কেউ নেই।' বলল রঙ্গা।

ওর কথা না শোনার ভান করে ভেঙ্কাম্মার দিকে তাকিয়ে রাজু বলল, 'ভেঙ্কাম্মা, শুনলাম তোমরা নাকি লক্ষ্মীর জন্য আলাদা পাত্র খুঁজছ? আমাদের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেছে, পান-সুপারির আদান-প্রদান হয়ে গেছে, এরপর অন্যত্র লক্ষ্মীর বিয়ে হলে তোমাদের মান সম্মান থাকবে?'

'ওরে এই হিঁজড়ে, তোর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেব কি?' বলল রঙ্গা।

তাতেও রাজু ধৈর্য হারাল না। ভেঙ্কাম্মাকে বলল, 'আমাদের দুই পরিবারের মিল হলে আমাদের ভাল হবে, গাঁয়েরও মঙ্গল হবে। এই কথাটাই বলতে এসেছি।'

'আমাদের অভাব কিসের? গাঁয়ের অবস্থাও ঠিক আছে। তোমাদের যদি কোন কিছুর অভাব হয়ে থাকে, সে কথা আমাদের বলে কি লাভ?' বলল ভেঙ্কান্না।

'এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাব লিঙ্গ বিলের কাণ্ড?' বলল রঙ্গা।

'ভেঙ্কান্না, রাস্তার কুকুরের মত যারা ঘুরে বেড়ায়, যাদের কাজকর্ম কিছু নেই, তারাই এর কথা ওর কাছে, ওর কথা এর কাছে লাগিয়ে ঝগড়া বাড়ায়।'

'কি? আমাকে কুকুর বলা হচ্ছে?' বলেই রাজুর গালে ঠাস করে চড় কষল রঙ্গা।

লক্ষ্মী ব্যালকনি থেকে এমন ভাবে ঝুঁকে পড়ল যেন পড়ে যাবে। অদূরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাপ্পা, পাদ্দালু ও সুব্বাইয়ার দলের অনেকে। তারা এগিয়ে আসতে গেলেই 'থামো' বলে রাজু চিৎকার করে উঠল সে।

'যে যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!' তারপর রঙ্গার দিকে ঘুরে রাজু বলল, 'নেহাৎ মিটমাটের কথা বলতে এসেছি, তাই বেঁচে গেছ এ যাত্রা। তা না হলে তোমাকে এখানেই পুঁতে ফেলতাম।'

ঠিক তখনই সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে রাওয়াইয়া এই কথা শুনল।

'বাড়িতে এসে ধমক দিচ্ছ?' বলল রাওয়াইয়া।

'এসেছিলাম আপনার কাছে বিচার চাইতে। ধমক দিতে আসিনি। কি বলেছি, ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন।' বলেই রাজু সোজা বেরিয়ে গেল। তার পিছু নিল গঙ্গাপ্পা, পাদ্দালু প্রভৃতি।

রাওয়াইয়ার নজরে পড়ল লক্ষ্মীর থমথমে মুখ। লক্ষ্য করল রাজু রাজার মতই হেঁটে চলে গেল। অতগুলো লোকের মধ্যে তাকে সেই মুহূর্তে অনেক বড় মনে হল। এমন কিছু একটা হয়েছে যার জন্য ঠিক রাজু দায়ী নয় বলে তার মনে হল। কিন্তু সে জানে তার আশে পাশে যারা আছে তারা কেউ সত্যি ঘটনা বলবে না। তার মধ্যে বিরক্তি পুঞ্জীভূত হতে লাগল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'যাও, যাও। তোমরা সব এখান থেকে চলে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে

দূর হও।' সবার যাওয়ার পর রাওয়াইয়া মুখের চুট্টা হাতে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। সে গিয়ে বসল বৈঠকখানা ঘরে।

'বাওয়ার রাগ একটু কমেছে বোধ হয়, না ভেঙ্কায়া?' বলল ধর্মরাজু। সে ভাবল দিন কয়েক চারজনকে নিয়ে বসার ব্যবস্থা রাওয়াইয়ার বৈঠকখানায় না করে গোপনে মাঙ্গাম্মার ঘরে করবে। ওদের বৈঠক হবে গোপন বৈঠক। এতে গোপনতাও থাকবে আর তার পক্ষেও সুবিধে হবে।

এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল মাঙ্গাম্মার ঘরে বৈঠকের ব্যবস্থা করার। লিঙ্গরাজু এখন বেশির ভাগ সময় মাঙ্গাম্মার ঘরে কাটায় বলেই তার ধারণা। রাতদিন নানা কাজে ধর্মরাজুকে ব্যস্ত থাকতে হয়। মল্লম্মার উৎসব পণ্ড হওয়ার পর থেকে রাওয়াইয়া তাকে রাতদিন ডেকে পাঠায়। ভাল মন্দ সব রকম কাজের পরামর্শ দিতে হয়। তাই তাকেও রাতটা নিজের বাড়িতে কাটাতে হয়। মাঙ্গাম্মার সঙ্গে ধর্মরাজুর সম্পর্কের কথা রাওয়াইয়া যে জানেনা তা নয়। তবু মাঙ্গাম্মার বাড়িতে ধর্মরাজুর খোঁজ করে ডেকে পাঠাতে হবে—এটা ভাল দেখাবে না। তা ছাড়া ইদানীং কাজের চাপ এত বেশি বেড়েছে, এত বেশি মাথা খাটাতে হচ্ছে যে ফূর্তি করার আর মেজাজ নেই। তবু লিঙ্গরাজু মাঝরাত্রে বাড়ি ফিরবে এটাইবা সহ্য করে কি করে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই ব্যবস্থা সে করল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনতে হয় আর থানায় হাঁটা হাঁটি তো আছেই। মাঙ্গির ঘরে দপ্তর করলে ভেঙ্কায়া ও রঙ্গাকে আরও কাছে পাওয়া যাবে। আরও জটিল এবং গোপন কাজ সারা যাবে। আর সে যতক্ষণ থাকবে মাঙ্গির ঘরে লিঙ্গরাজু সেদিকে ঘেঁষবে না। আর যদিও বা যায়, তাকে নিজের কাছে রাখবে। বাপ কি ভাবে কোন্ কাজটা বুদ্ধি খাটিয়ে করছে সে দেখবে। এইভাবে যদি শিখতে পারে, তবে তার ভবিষৎ ভাল হবে। মাঙ্গির গলার ছুটো হার দেখে লিঙ্গরাজুর উপরে ভীষণ সন্দেহ হল। মাঙ্গি হয়ত মাথায় হাত বুলিয়ে তার কাছ থেকে আদায় করেছে।

চারজন গুণ্ডা ধরনের লোককে ধর্মরাজু কি যেন বুঝিয়ে দিয়ে বলল,

'রাজুকে শেষ বারের মত একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। অতএব, আজ রাত্রেই হয়ে যাক।'

রাওয়াইয়ার বাড়ি থেকে ফিরে রাজুর মনে অনেক কথাই জাগল। নিজের উপর ভরসা বাড়ল। রঙ্গা থাপ্পড় মারলেও সে ধৈর্য হারায়নি। ঘটনা যে কি তা রাওয়াইয়া ঠিক বুঝতে পারবে। নিশ্চয় তা নিয়ে ভাববে। অনেকদিন পর লক্ষ্মীকে সে দেখল। মেয়ের কাছ থেকে কি বাপ কিছুই শুনবে না? একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত রাজু ক্ষেতে খামারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কল্যাণ পাল্পুর যে জায়গায় ট্রাক্টর পুড়েছিল সেইখানে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল রাজু। ট্রাক্টর পোড়ার পর থেকে সুব্বাইয়ার লোকজন রাতদিন পাহারা দিচ্ছে।

'ছোট কর্তা, বাড়ি যান। অনেক রাত হয়েছে।' বলল পাদ্দালু।

তুমি পাহারা-ঘরে গিয়ে ঘুমোও। আমার যখন ঘুম পাবে আমি বাড়ি চলে যাব।

পাদ্দালু পাহারা ঘরে গেল। রাজুর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। হাঁটতে হাঁটতে লিঙ্গ বিলের পাড়ে এল। বসল। একটা চুট্টা ধরাল। বিলের ঘাটে ধোপাদের কাঠের উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে। বিলের জলে আকাশের ছবি।

বেড়ার ওপাশে চার পাঁচজন লোক সন্তর্পণে হাঁটছে। কিছুক্ষণ পরে ওরা বেড়া টপকে এদিকে এল।

'পাহারা ঘরে ঘুমিয়ে আছে বোধহয়।' একটি কণ্ঠস্বর।

তোমরা এইখানেই থাকো। আগে আমি ঢুকে এক হাত নিই।' বলল রঙ্গা।

'আমি আসব বাবু?' ভেঙ্কটেশ বলল।

'আরে ও বেটা হয়তো ঘুমোচ্ছে! ও আমাকে কি করবে! খুব বলেছিল, আমাকে পুঁতে ফেলবে!' বলতে বলতে রঙ্গা এগিয়ে গেল। বাকি তিনজন তার পিছনে পিছনে গেল। 'তোমাদের আসতে হবে না। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। প্রয়োজন হলে ডাক দেব।' বলল রঙ্গা।

তিনজনেই থেমে গেল।

পাহারাঘরের দরজা ঠেলতেই পান্দালুর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু সে কোন শব্দ করল না। ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল। একটা ছায়া ছায়া মূর্তি যেন ঘরে ঢুকল। কে যে ঢুকেছে পান্দালু ঠিক বুঝতে পারল না। ঘাপটি মেরে পড়ে রইল। তার ধারণা চোর ঢুকেছে। একটু নড়লেই টের পেয়ে চোর পালাবে। ভারি শাবলের ছোট্ট শব্দ হল। পান্দালু একটু গড়িয়ে সরে গেল। শাবল মাটিতে গেঁথে রইল। পান্দালু হঠাৎ ঝাপটে ধরল চোরকে। চোর চমকে উঠে বলল, 'আরে তুই?' পান্দালুকে দেখে রঙ্গা বলল। পান্দালুও চিনতে পারল রঙ্গাকে।

'ও, আমাকে খুন করতে এসেছ?'

তারপর শুরু হল দুজনের দাপাদাপি। পান্দালু এমনিতেই সাহসী। তার উপর সারা ক্ষেতে সুব্বাইয়ার লোক পাহারা দিচ্ছে। অতএব ভয়ের কোন কারণ নেই। রঙ্গাও জানে তার লোক দরজার বাইরে। ফলে একে অন্যকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করতে উঠে পড়ে লাগল। পান্দালুর হাতের লাঠি ভেঙে গেল শাবলের ঘায়ে। শুরু হল ধাক্কাধাক্কি। পান্দালু একবার প্রচণ্ড জোরে ঠেলে ফেলে দিল রঙ্গাকে। পরক্ষণে 'আঃ' শব্দ শোনা গেল। পান্দালু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। লাঠি ভেঙে যাওয়ার ফলে তার গায়েও কয়েক ঘা পড়েছিল।

একটি দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল। সেই কাঠির আলোতে দেখল রঙ্গা পড়ে রয়েছে। রঙ্গার মাথা লাঙ্গলের ফলা আর রক্ত একাকার হয়ে গেছে। তক্ষুণি মনে হল দরজার কাছ থেকে কয়েকজন সরে গেছে। রাজু আরেকটি দেশলাই কাঠি জ্বালল। দেখল রঙ্গার চোখে কোন ভাষা নেই। তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ি টিপে দেখল। কোন স্পন্দন সে টের পেল না। শরীরে কিছুটা উত্তাপ আছে। ততক্ষণে পান্দালু কাদের যেন ভাগিয়ে দিয়ে এসেছে।

'ছোট কত্তা, এখনও বাড়ি যাননি?' পান্দালু বলল।

'ঘাটে বসেছিলাম। কিসের যেন শব্দ শুনে চলে এলাম। কিন্তু কি ব্যাপার? রঙ্গা পড়ে রয়েছে ভেতরে?' রাজু বলল।

'আমাকে খুন করতে এসেছিল।'

'তোমাকে নয় আমাকে।'

'তা এখনও ভেতরে ও কি করছে?'

'কোন নড়াচড়া নেই। বেঁচে আছে কি না কে জানে।'

'এঁ্যা! ব্যাটা মরেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। লাঙ্গলের ফলা, ওর মাথা আর রক্ত একাকার হয়ে রয়েছে।'

'তাহলে এখন কি করা যায়, ছোট কত্তা?'

'তাই তো ভাবছি, ওদের বাড়িতে খবর পাঠানো যায় কি করে!'

'ওদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে আর ধড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।' বলল পাদ্দালু।

'তা ঠিক। তাহলে আমাকেই যেতে হবে।' বলল রাহু।

'না বাবু, আমার জীবন থাকতে তোমায় যেতে দেব না।'

'বলা যায় না, হয়ত এখনও প্রাণ আছে। এক কাজ কর, তুমি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে খবর দাও আর ওদের ডাক্তার নিয়ে আসতে বলো।'

'মড়া আমাদের পাহারা-ঘরে থাকলে বিপদ আছে কত্তা। এক কাজ করা যাক, ওটাকে বেড়ার ওপাশে ফেলে আসি।' বলল পাদ্দালু।

'ছিঃ, ওসব পাগলামি করতে নেই।'

'তাই বলে, আপনি এখানে একা থাকবেন?'

'কোন ভয় নেই। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।'

'আঃ!' পাদ্দালু আর্তনাদ করে উঠল।

'কি হল?'

'হাঁটুর গিঁটে খুব জোরে লেগেছে। এর সঙ্গে আরও তিনজন এসেছিল তো? হাতের লাঠিটা ভেঙ্গে গেছে। সেই ভাঙ্গা লাঠি নিয়েই তাড়া করেছি। ব্যাটারা খুব জোর বেঁচে গেছে।'

'দেখি কোথায় লেগেছে?'

'ছি-ছি কি করছেন? পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?'

'চুপ কর, দেখি। এইখানে লেগেছে? হাড়ে? ইস্!'

গাড়ির চাকায় দেওয়ার জন্য রেড়ির তেল রাখা ছিল। রাজু পাল্দালুর পায়ের চোট লাগা জায়গায় ঐ তেল দিয়ে মালিশ করে দিল।

'আমি হাজার বার বারণ করেছি ওকে, তবু গেল? না জানিয়েই গেল! ওকে মেরে ফেলার জন্য ও একা গেল কোন্ সাহসে? এখন ঐ পান্দালুকে গুম্ করতে না পারলে আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে। বাবার কাছে কিছুই আর গোপন থাকবে না। তোমাকে আমাকে সবাইকে চিরে ফেলবে।' ভেঙ্কাম্মা বলল।

তারপর সে 'রঙ্গা রঙ্গা' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাঙ্গাম্মা, লিঙ্গরাজু, ধর্মরাজু প্রভৃতি তাকে ধরল। ভেঙ্কটেশই প্রথমে রাওয়াইয়ার বাড়িতে গিয়ে কায়দা করে ভেঙ্কাম্মাকে ডেকে আনল। মাঙ্গাম্মার ঘরে আনার পর গুছিয়ে ধর্মরাজু তাকে জানাল রঙ্গার মৃত্যুর খবর। সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ল ভেঙ্কাম্মা। প্রথম ধাক্কাটা সামলানোর পর আস্তে আস্তে ধর্মরাজু মনের কথা বলল। 'দেখ ভেঙ্কাম্মা, এখন তুমি যতই কাঁদনা কেন যে মারা গেছে সে কি আর বেঁচে উঠবে?' বলল ধর্মরাজু।

'তা নয়। ওদের পাহারার ঘরে কেন ঢুকল রঙ্গা। বাবা বলবে তোমাদের অজান্তে ঐকাজ রঙ্গা কোন ক্রমেই করতে পারে না। আমি বাবাকে কি বলে বোঝাব? ও হো হো রঙ্গা।' আবার কাঁদতে লাগল ভেঙ্কাম্মা।

'কি করতে হবে, কি বলতে হবে সব আমি ভেবে রেখেছি। তোমার কোন ভয় নেই। শোন, শবের কাছে এখনও রাজু বসে আছে। সুব্বুটাকে পাঠিয়েছি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ডেকে আনতে। ওকে বলেছি সোজা পাহারা ঘরে পুলিশকে নিয়ে যেতে। রঙ্গাকে মেরে ফেলতে রাজুকে দেখেছে বলে আমাদের লোক পুলিশের কাছে সাক্ষী দেবে। রাজুকে খুব সহজে খুনের আসামী করা যাবে। কোন অসুবিধা হবে না। সব ঠিক হয়ে গেছে।' বলল ধর্মরাজু।

পান্ধালুর পায়ের ব্যথা একটু কমলে সে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু তার আগে বড়কর্তাকে খবর দেওয়ার জন্য লিজবিলের কাছে যেতে না যেতেই তাকে দুটো লোক বিড়ালের মত অনুসরণ করল। হাতের লাঠিটা ভাঙা থাকাতে পান্ধালুর যেন একটু সাহস কমে গেল। হাতে লাঠি থাকলে দশজন এলেও তার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু যাই হোক, বড় কর্তাকে খবর না দিয়েই বা উপায় কি।

নদী পথে সে নামল। কাছেই ডোম পাড়া। ভাবল আগে বাড়ি গিয়ে লাঠি নিয়ে যাবে বড় কাপুর বাড়িতে। পান্ধালু বুঝতে পারল যে তাকে কেউ অনুসরণ করছে। পান্ধালু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তারপর আর না হেঁটে ছুটল

নিজের ঘরের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল পান্ধালু। দরজায় ধাক্কা মারল। দরজা খুলে গেল। ঐ মাঝ রাতে দরজা খোলা দেখে পান্ধালুর আশ্চর্য ঠেকল। কিন্তু তা নিয়ে বেশিক্ষণ ভেবে সময় নষ্ট করা যায় না। তাড়াতাড়ি দরজার কোণ থেকে লাঠি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

'বাবা!' বলে দরজার বাইরে এল রাবি।

পান্ধালু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল পুল্লি ও রাবির দিকে। তাদের চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ।

'কি হল?' বলল পান্ধালু।

'তুমি যেও না।' বলল পুল্লি ভাঙা গলায়।

'বুড়ভাকে তুলে নিয়ে গেছে।' বলল রাবি।

'বুড়ভাকে?' বলল পান্ধালু।

'ওর প্রাণের কোন ভয় নেই। তুমি যদি আমাদের কথামত চল তাহলে ওকে মেরে ফেলা হবে না।' বলতে বলতে পোতু, পেন্টাইয়া কোণের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

'চোট্টার বাচ্চা!' বলে পান্ধালু লাঠি তুলল। পুল্লি এগিয়ে লাঠিটা ধরল।

'তুই যদি ফের লাঠি তুলবি তো আমার মাথার দিব্যি।' বলল পুল্লি।

'বাবা, তুমি বাধা দিলে আমাদের বুড়ভাকে ওরা জানে মেরে

ফেলবে।' বলল রাবি। তার গলা ভার হয়ে গেল।

'আমরা যা বলব তা করলে তুমি আর বুড়তা দুজনেই বাঁচবে। আর তা না হলে রঙ্গাকে যে ভাবে তোমার ছোটকর্তা মেরে ফেলেছে ঠিক সেইভাবে আমরা মেরে ফেলব তোমার বুড়তাকে। তারপর......'

'মিথ্যা কথা বলার জায়গা পাওনি! ছোটকর্তা ঐ সময় ধারে কাছে ছিল না। আমাকে মারতে এসে সে নিজেই মরেছে।' বলল পান্দালু।

'ওসব ব্যাপার পুলিশ খুঁজে বের করবে। তুমি এখন আমাদের সঙ্গে এসো।' বলল ভেঙ্কটেশ।

'কোথায়?' পান্দালু প্রশ্ন করল।

'ওসব জানবে পরে। বেশি দিন থাকতে হবে না। তোমার ছোট কর্তা যে খুন করেছে তার সাক্ষী দেওয়ার পরেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।' বারান্দায় উঠে এসে বলল আপ্পান্না।

'গাধার বাচ্চা কোথাকার। এসব তোদের করণমের কারসাজি। আমার প্রাণ থাকতে আমি ছোট কর্তার নাম খুন খারাবিতে জড়াব? এক্ষুনি গিয়ে আমি ইন্সপেক্টর সাহেবকে আসল ব্যাপার জানিয়ে দেব।' পান্দালু এগোতেই পুল্লি তার পা জড়িয়ে ধরল।

'ওরে তুই যাসনি রে। তুই গেলে ওরা বুড়তাকে মেরে ফেলবে। আমাকে তুই কেন এভাবে পাগল করছিস।' বলে পুল্লি চুল ছিঁড়ে বুক চাপড়াতে লাগল। পান্দালু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। ভাবনায় পড়ল সে। না গেলে ছোট কর্তার প্রতি ভীষণ অন্যায় হবে। এরা পুলিশ আনবে। পুলিশ দেখবে ছোট কর্তা রঙ্গার পাশে আছে। আর এইসব কিছু উপেক্ষা করে গেলে তার কোলের বাচ্চাকে এই কসাইরা মেরে ফেলবে।

ঠিক তখন দুজন পান্দালুর দুটো হাত ধরে নিয়ে গেল তাকে। যাওয়ার সময় রাবি ও পুল্লিকে ওরা বলে গেল তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ যদি কাউকে কিছু বল তাহলে বুড়তা আর পান্দালু দুজনেরই মড়া পড়ে থাকবে পথে। রাবি মাকে ধরে তুলে খাটিয়ার উপর শোয়াল।

পান্ধালুর গিয়ে তৃতিন ঘন্টা হয়ে গেল। ভোর হয়ে এসেছে। পান্ধালুর আবার কিছু হয়নি তো! তা ছাড়া আমিই বা রক্তার শবের কাছে এভাবে হাঁ করে বসে আছি কেন? রাজু ভাবল। বাড়িতে গিয়ে বাবাকে দাদাকে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা আমার জানানো উচিত। এ ভাবে বসে থাকা তো আর উচিত নয়। রাজু চলল বাড়ির দিকে। তারপর খবর দিতে হবে পুলিশকে। কত কাজ আছে।

নদী পেরোনোর পর রাজুর মনে হল একবার পান্ধালুর বাড়ি গিয়ে খবর নেওয়া উচিত ।

পান্ধালুর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিল। রাবি দরজা খুলে তাকে দেখে থ বনে গেল। পুল্লি উঠে এল। আবছা আলোতে তাকে দেখে মনে হলো যেন সে অনেক দিন শয্যাশায়ীছিল। বড় ধরনের কোন কঠিন অসুখ করেছে তার।

'পান্ধালু নেই?' রাজু জিজ্ঞেস করল।

'দয়া করে ভেতরে আসুন। কেউ দেখে ফেলবে।' বলে হাত ধরে রাবি ঘরের ভিতরে টেনে নিল। রাজু তার আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেল। সে বলল, 'কি হয়েছে? ওরকম করছ কেন?'

হাউ মাউ করে কেঁদে পড়ল পুল্লি। মাকে ধরে চুপ করাতে করাতে রাবি বলল, 'ওকে আর বুড়তাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

রাজু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কারা?'

ঘটনাটা জানাল রাবি। রাজু ভীষণ ঘাবড়ে গেল রাবির কথা শুনে।

'যাই ঘটুক, আমি কিন্তু গিয়ে পুলিশকে সব বলে দেব।' বলল রাবি।

'রাবি।' বলে কেঁদে পড়ল পুল্লি।

'এখন যেতে হবে না, রাবি।' বলল রাজু।

'আপনাদের নুন খাই, আপনাদের এত বড় বিপদ, কি করে চুপ করে বসে থাকব, বাবু?' বলল রাবি।

'আরে, এখনও তো আমার উপর কেস কেউ করে ফেলেনি। আগে করুক, তারপর দেখা যাবে। তুমি কিন্তু কাউকে এ বিষয়ে কোন কথা

এখন বলতে যেয়ো না। ওরা কসাই। যা ইচ্ছে তাই হঠাৎ করে ফেলতে পারে।' বলল রাজু।

ভেঙ্কটেশ পুলিশ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে এল পাহারা-ঘরের কাছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। দরজা খুলে টর্চ ফেলে সে দেখল। শুধু রঙ্গার শবটাই পড়ে রয়েছে।

'ফেরার হয়ে গেছে বোধ হয়।' বলল ভেঙ্কটেশ। ইন্সপেক্টর পাহারা-ঘরের চারদিকে, ঘরের আনাচে কানাচে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। রাজুর কোন পাত্তা নেই।

রাজু পুল্লি ও রাবিকে অভয় দিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। দূর থেকে সে দেখতে পেল বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি। তখনও আবছা অন্ধকার রয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভেবে নিল কি করবে। এগোবে না পেছোবে। ততক্ষণে কোথেকে যেন উড়ে এল মল্লি।

'চল।' বলল মল্লি।

গোপনে অন্য পথে সেখানে এসেছে মল্লি। রাজুকে অ্যারেস্ট করার ওয়ারেণ্ট নিয়েই নাকি পুলিশ এসেছে। দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে যাবে।

'আরে, আমি তাকে মারিনি!' রাজু বলল।

'ওরা যে তা বিশ্বাস করবে না। অনেক প্রমাণ নাকি আছে।' বলে রাজুর হাত ধরে মল্লি ঝোপ ঝাড় দিয়ে নিয়ে গেল।

গণাচারি তখনি স্নান করে উঠল। স্নান সেরে সে ঘাটে উঠল। মল্লি তার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে গেল। গণাচারি আশ্চর্য হয়ে গেল এত ভোরে মল্লিকে দেখে। মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে দরজা বন্ধ করে দিল। পরে মন্দিরের পেছনের কলকে ফুলের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রাজু। গণাচারি এসবের কিছু বুঝতে পারছিল না। মল্লি সংক্ষেপে তাকে ঘটনাটা জানিয়ে বলল, 'জ্যাঠামশাই, আপনাকে কেউ কোন পক্ষের লোক বলে সন্দেহ করে না। এখন আপনাকে আমার বাওয়াকে বাঁচানোর ভার নিতে হবে। না হলে বিপদ ঘটে যাবে। পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।'

মল্লির গলা কাঁপতে লাগল। গণাচারি দ্বিধাগ্রস্ত।

'বেশি দিন না। বুড়ভা আর পান্দাজুকে উদ্ধার করা পর্যন্ত।' মল্লি গণাচারিকে এমন ভাবে বলল যেন প্রার্থনা করছে।

'আমি ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখব মা ?' বলল গণাচারি।

'মায়ের প্রতিমা অনেক বড়। তার পেছনে লুকিয়ে রাখার অনেক জায়গা আছে।' মল্লি বলল।

গণাচারি কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'ঠিক আছে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লি সকৃতজ্ঞ চিত্তে গণাচারিকে জড়িয়ে ধরল। রাজুকে মন্দিরের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল। মন্দিরের মূর্তির পেছনে, কোন এক সময়, চোর সিঁদ কেটেছিল। এখন সেই ফুটো দিয়ে রাজুর জন্য খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

মল্লি খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকল। ঢুকে দেখে সে এক অদ্ভুত অবস্থা। শেষাম্মা বুক চাপড়ে কাঁদছে। সুব্বাইয়া খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মত দ্রুত পায়চারি করছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল, 'সুব্বাইয়া মশাই, আপনার ছেলেকে রঙ্গার মৃত দেহের পাশে বসে থাকতে দেখেছে এমন কয়েক জন সাক্ষী আছে।'

'আমার ছেলে ক্ষেতে যায়নি। সারা রাত বাড়িতে ছিল।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে সুব্বাইয়া বলল।

'তাহলে ডাকুন ওকে।' পুলিশ ইন্সপেক্টর হাসতে হাসতে বলল।

'আমরা ডাকব না। আমাদের বাড়িতে ঢুকে খুঁজতেও দেব না।' বলল পুন্নাইয়া। মল্লি হঠাৎ হাজির হল সেখানে। এর ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ হাবার মত তাকিয়ে বলল, 'খুঁজুক না বাওয়াকে।'

ইন্সপেক্টর বুঝল রাজু বাড়িতে নেই। থাকলে মেয়েটা এভাবে বলত না। তবু কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেকটা ঘর দেখল কনস্টেবলরা। তারপর ইন্সপেক্টর বলল, 'সুব্বাইয়া মশাই, আমাদের হাতে আপনার ছেলে ধরা দিলেই ভাল করত। পালানোর ফলে কেস আরো জটিল হয়ে যেতে পারে। কালকে আপনার ছেলে রাওয়াইয়ার বাড়িতে গিয়েছিল। রঙ্গাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে বলেছিল আর গভীর রাত্রে রঙ্গার শবের কাছে একা ছিল। এর প্রত্যেকটি ঘটনার বহু সাক্ষী আছে।'

ইন্সপেক্টর চলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা সুব্বাইয়ার কাছে অত্যন্ত জটিল ও অসহনীয় ঠেকছে। রাজু ক্ষেত থেকে কোথায় গেল? রঙ্গার মৃতদেহই বা পাহারা ঘরে এলো কোত্থেকে? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর সে খুঁজে পেল না। তার ধারণা হল রাত্রে ক্ষেতে নিশ্চয় মারামারি হয়েছে। সেই মারামারিতে রঙ্গা মারা গেছে। রাজু ভয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে।

সুরালুর কান্না কেউ থামাতে পারছে না। সে বুক চাপড়ে কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছে। ধর্মরাজু, লিঙ্গরাজু, ভেঙ্কান্না শহর থেকে পোস্টমর্টেম করিয়ে রঙ্গার মৃত দেহ বাড়িতে আনতে আনতে তিনটে বেজে গেল। সারাদিন কেউ এক ফোঁটা জল মুখে দেয়নি। লক্ষ্মী মার কাছেই বসেছিল সারাক্ষণ। কিন্তু একটি কথাও বলেনি। এতদিনে লক্ষ্মীর কোন এক তার যেন ছিঁড়ে গেল। বাজ পড়া গাছের মত তাকে দেখাচ্ছিল। রাওয়াইয়া মাঝে মাঝে চিৎকার করে বউকে চুপ করতে বলছে। সেটা তার রাগ নয়। দুঃখ বলা যেতে পারে। তার চোখে কোনদিন জল দেখা যায়নি। তার ফাটা ছেরা গলার আওয়াজে রঙ্গার প্রতি তার টান অনুভব করা যায়।

রঙ্গার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য তুলতেই সুরালুকে দশজনও ধরে রাখতে পারছিল না। রাজুকে উদ্দেশ্য করে, সুব্বাইয়ার পরিবারের লোককে উদ্দেশ্য করে, কত লোককে জড়িয়ে কত কথা যে বলে বলে কাঁদছিল তার ইয়ত্তা নেই।

ধর্মরাজু ও লিঙ্গরাজু উঠে পড়ে না লাগলে রঙ্গার মৃতদেহ হয়ত সেদিন উদ্ধারই হত না।

রাত্রি নটা বাজল। শ্মশান থেকে সবাই ফিরল। রাওয়াইয়ার মুখে কোন কথা নেই। একটি কথা বললেও ধর্মরাজু এগিয়ে যেত। কিন্তু নীরব থাকলে তার কাছে যাওয়ার সাহস কারও নেই। রাওয়াইয়ার এই কঠিন নীরবতা ধর্মরাজুর কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার মনে

হল রাজুকে এই মুহূর্তে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলে রাওরাইয়ার মন হালকা হতে পারে।

অনেকক্ষণ অদূরে বসেও ধর্মরাজু সাহস পেল না কোন কথা বলার। উঠে পড়ল সেখান থেকে। ভেঙ্কাম্মাকে নিয়ে গাড়ি করে রওনা হয়ে গেল। প্রথমে পাদ্দালুকে লোভ অথবা ভয় দেখিয়ে হাত করতে হবে। তবে তার জন্য সোজা পাদ্দালুর কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই। পুল্লিকে আনতে হবে।

ডোম পাড়া থেকে অনেক দূরে সে গাড়িটা রাখল। পাদ্দালুর বাড়িতে কেউ আছে কিনা দেখে আসতে বলল। পুল্লি একাই আছে। রাবি না থাকার ফলে ধর্মরাজু একটু স্বস্তি বোধ করল। এখন সে পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারবে। 'বুড়তাকে দেখবে চল'। বলে পুল্লিকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল।

দিন কয়েক লিঙ্গরাজু মাঙ্গাম্মার সঙ্গে একান্তে কাটাতে পারেনি। ধর্মরাজু বেশির ভাগ সময় মাঙ্গাম্মার ঘরে বসে পরিকল্পনা করে আর সে গুলো কার্যকরী করে! লিঙ্গরাজুর ভীষণ রাগ ধরল তার বাপের উপর, গাঁয়ের উপর—সব কিছুর উপর।

শব নিয়ে অতকাণ্ড না করলেই পারত। যাই হোক এখন ভেঙ্কাম্মাকে নিয়ে গাড়ি করে ধর্মরাজু কোথায় গেছে তা লিঙ্গরাজু দেখল। ভাবল সে রাত্রে আর তার বাবা ফিরবে না। মাঙ্গাম্মার সঙ্গে কাটান যাবে।

সন্ধ্যের পর ভাত তরকারি নিয়ে মল্লি মন্দিরের পেছন দিকে গেল। সিঁদ কাটা ফুটো দিয়ে খাবার ভেতরে চালান করে দিল। রাজু আস্তে আস্তে বলল, 'একটু বেরোতে হবে। আজ রাত্রের মধ্যে খোঁজ করতে হবে পাদ্দালুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে। রাবি আর গঙ্গাম্মাকে ডেকেছ?'

'তেতুল গাছের কাছে ওরা আছে। এখন কি করতে হবে বল। তোমার এখন বাইরে না আসাই ভাল। যা করতে বলবে, আমারাই করতে পারব।' মল্লি অনুরোধ করার মত বলল।

'আমি না বেরোলে হবে কোথেকে? গঙ্গাম্মাকে দিয়ে সব কাজ

হয় ? আমি যে এখানে আছি তা বাবা ও দাদাকে জানানোর দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে সব গোলমাল করে ফেলবে।' রাজু বলল।

'ঠিক আছে।' বলল মল্লি। তার খুব ভয় করতে লাগল। আশঙ্কাও তার মনে দানা বাঁধছে।

রাত বারোটা বেজে গেল। মাজি লিঙ্গরাজুকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। বেশ কয়েক দিন পরে সে আজ সুযোগ পেয়েছে। কিছু টাকা নানা অজুহাতে আদায় করে নিতে চায়। এ কদিন ধর্মরাজু মিষ্টি কথাতেই ভুলিয়ে রেখে ছিল। লিঙ্গরাজু কথা দিল, পরে টাকা এনে দেবে। কিন্তু মাজি তাতে রাজী নয়। রাগে অভিমানে মাজিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল খাটের উপর। আর ঠিক সেই সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। লিঙ্গরাজু বুঝল তার বাবা এসে গেছে। কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে মাজি দরজা খুলল।

রাবি মাজির হাতে দশটা পয়সা দিয়ে তেল চাইল। মার নাকি ভীষণ পেট ব্যথা করছে। তেল মালিশ করে সেঁকতে হবে। মাজি তেল আনতে গেল। তারপর কি যে হল, মাজি অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না। তার চোখ ভরে গেল তেলে। রাবিকে ধরতে গেল সে কিন্তু পারল না। রাবি তার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। মুখে পুরল তিলের খোল। তারপর রাজু ঢুকল ঘরে। দরজা বন্ধ করল। সমস্ত ঘর খুঁজে খুঁজে দেখল। কাপড়ের পোঁটলা তোলার মত সে লিঙ্গরাজুকে তুলল। লিঙ্গরাজুর মনে হল সে মরে গেছে।

'পান্নালুকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে রে ?' রাজু জিজ্ঞেস করল। লিঙ্গরাজু মাথা নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

'বুড়তাকে কোথায় রাখা হয়েছে ?'

আবার একই ভাবে মাথা নাড়ল লিঙ্গরাজু। এভাবে প্রশ্ন করে কোন লাভ হবে না জেনে রাজু তাকে খাটের সঙ্গে বাঁধল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাজু। তার বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে রাবিও বেরিয়ে গেল। মাজি উঠে চোখ মুছে রাগে গজ গজ করতে করতে লিঙ্গরাজুকে খুঁজল। ওকে দেখতে পেল বিছানায় পড়ে থাকতে। বেরিয়ে যেতে

বলল ঘর থেকে। চিৎকার করে জানিয়ে দিল যে এবার ওকে বা ধর্মরাজুকে, কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। নিজরাজুর একদিকের ভয় যেতে না যেতেই অন্য দিকের ভয় দেখা দিল। ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। ঠিক এ রকম একটা সময়ে গাড়ি থেকে নামল ধর্মরাজু।

চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে ফিরে এসেছে ধর্মরাজু। পুলিকে নিয়ে গিয়ে পান্দালুর সামনে, বুড়তার সামনে, কত ভয় দেখাল কিন্তু কিছুতেই তাদের সাক্ষী হিসাবে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেল না। এত গরিব লোকের মধ্যেও যে এই রকম নির্লোভী মন থাকতে পারে, তা ধর্মরাজু বুঝতে পারেনি। ফলে তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। এ রকম একটা বিরক্তি নিয়ে ফিরে এসে দেখল মাজি তার ছেলেকে মারছে।

মুহূর্তে তার মাথা আরও গরম হয়ে গেল। ধরে আচ্ছা করে ঠেঙাল মাজিকে। মাজি বুক চাপড়ে, চিৎকার করে, নানা কথা বলে কাঁদতে লাগল। এমন সব কথা যা শুনে ধর্মরাজুর বুক ধড়ফড় করে উঠল।

আরে সর্বনাশ! সব ফাঁস হয়ে যাবে! তাড়াতাড়ি মাথা ঠাণ্ডা করে মাজির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল। মাজি কিছু-তেই থামল না। শেষে খরচ করার জন্য ভেঙ্কান্না তাকে যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল তার থেকে একশো টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে, অনেক ভাল ভাল কথা বলে, ঠাণ্ডা করল। তার মাথা গরম হওয়ার নেপথ্য কাহিনীও জানাল। মাজিও জানাল তার ছেলেকে ঠেঙিয়ে বের করে দেওয়ার আগের ঘটনা।

শুনে ধর্মরাজু ভাবল, তাহলে রাজু ধারে কাছেই আছে! কোথায় থাকতে পারে? ভাবতে ভাবতে কপালের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠল।

তেঁতুল গাছের কাছাকাছি একটা ঝোপে বসে গঙ্গাপ্পা, মল্লি, রাজু, রাবি পরবর্তী কর্মসূচী ঠিক করছিল। রাজু ধরা পড়লে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে। আবার সে মন্দিরের ভেতর লুকিয়ে থাকলে বাইরের কাজ করার সাহস গঙ্গাপ্পার আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি একটু কম। পুন্নাইয়াকে এ কাজে

নামানো যায় না। সব গোলমাল হয়ে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। মল্লি রাজুকে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়তে তাড়া দিল।

রাজু দীঘির ঘাটে উঠতে গিয়ে দেখল, বট গাছের নিচে ছায়া ছায়া কতকগুলো মূর্তি। তৎক্ষণাৎ পেছনের দিকে ফিরে চলে গেল নিজের আস্তানায়।

গণাচারি মন্দিরের গেটের ভিতরে সজাগ হয়ে, কান খাড়া করে, শুয়ে আছে। কখন রাজু আসবে, দরজায় টোকা মারলেই দরজা খুলতে হবে। ছোট্ট আওয়াজ হলে গণাচারি দরজা খুলতেই রাজু ঢুকে যথা-স্থানে চলে গেল। গণাচারি মন্দিরের গেটে তালা লাগিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় আবার ধাক্কা। দরজা খুলেই দেখে ধর্মরাজ পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছে। পুলিশ দেখেই গণাচারির ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। পুলিশ দ্রুত মন্দিরের ভেতর ঢুকে, ঘুরে ঘুরে, দেখে এসে ইন্সপেক্টরকে বলল, 'কেউ নেই স্যার!'

'মূর্তি যে ঘরে আছে সে ঘরটাও দেখতে বলুন স্যার!' ধর্মরাজ বলল।

গণাচারির পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। সে মনে মনে মল্লম্মাকে ডাকল। ভাবল, ন্যায় অন্যায় মা মল্লম্মাই বিচার করবেন। পুলিশ ঢুকল দেবী মূর্তির ঘরে। খোঁজা-খুঁজি করে ফিরে এসে জানিয়ে দিল যে কেউ নেই। তখন ইন্সপেক্টর আবার পুলিশ নিয়ে ঢুকল নিজে ভাল করে দেখতে। মল্লম্মার সামনে পেছনে টর্চ ফেলে দেখে ফিরে এলো। ইন্সপেক্টর বলল, 'না নেই। পাখি নিশ্চয়ই উড়ে গেছে।' ধর্মরাজ, ইন্সপেক্টর ও পুলিশ চলে গেল।

ব্যাপারটা গণাচারির কাছেও অদ্ভুত ঠেকল। তাহলে রাজু গেল কোথায়? গণাচারি ভাবছে, আর এ-যাত্রা রাজু যে ধরা পড়েনি তার জন্য মল্লম্মাকে মনে মনে প্রণাম করছে।

আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচে নামল রাজু। গণাচারি মায়ের মূর্তির পেছনে এসে দেখে রাজু আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারল রাজু কোথায় ছিল। বিরাট মায়ের মূর্তি'র পেছনে উপরের দিকে ছুচোঁ পাথরের টুকরো ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। রাজু ঐ ছুচোঁ ধরে ঝুলছিল।

কোন অজানা কারণে টর্চের আলো ঐ ঘন অন্ধকারে ভরা অংশে পড়েনি। আবার এও হতে পারে রাজু যেহেতু প্রতিমার পেছনে সেঁটে রেখেছিল নিজেকে সেই হেতু হয়ত আলো পড়লেও নজর এড়িয়ে গেছে।

'আমি এখানে থাকলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে। আর এখানে থাকব না। বাড়ি চলে যাব।' বলল রাজু।

'না, রাজু, বিরাট একটা ফাঁড়া কেটে গেছে। আর তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হবে না। এর চেয়ে লুকোনোর ভাল জায়গা আর পাবে না। একবার যখন পুলিশ ঘুরে গেছে আর আসবে না এখানে।' বলল গণাচারি।

রাবি বাড়ি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুল্লি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। আবার নতুন বিপদ ঘটেছে বলে অনুমান করল রাবি। হয়ত বুড়তাকে কিছু করেছে। ডুকরে ডুকরে, কাঁদতে কাঁদতে পুল্লি বলল, 'ওর কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে, আমাকে দেখাল।'

'কার কাছে নিয়ে গিয়েছিল?'

'তোর বাবার কাছে। খাঁচায় বাঁধা বাঘের মত দেখাচ্ছে তাকে।'

'কোথায় আছে?...চুপ করে আছ কেন?'

'বললে দুজনকেই মেরে ফেলবে বলেছে।' বলল পুল্লি।

'কোন ভয় নেই। বল তাড়াতাড়ি বল। আমার বাবা আর বুড়তাকে উদ্ধার করার ভার আমাদের বড়কর্তা নেবেন। এক জনের খোঁজ পেলে অন্য জনকে ঠিক পেয়ে যাব।' রাবির পীড়াপীড়িতে পুল্লি মুখ খুলল।

মল্লি, গঙ্গাম্মা, রাবি মন্দিরের পেছনে এমন ভাবে আছে যেন তাদের কোন বিশেষ কাজ নেই। এমনি সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু ওদের কান খাড়া আছে। ভিতর থেকে রাজু যা বলছে ওরা তা শুনছে। 'পান্ডালুর কাছে যে কোন ভাবে আমাদের খবর পাঠাতে হবে। ওকে সব সময় আধ ডজন গুণ্ডা ধরনের লোক পাহারা দিচ্ছে বলেই অন্য কেউ গেলে ওরা সন্দেহ করবে। পাঠাতে হবে পুল্লিকেই। পুল্লি বুক চাপড়ে কেঁদে কেটে ওদের দুজনকেই দেখতে চাইবে। আমার ধারণা ওরা এখন যতই হোক আর একটা হত্যা কাণ্ডের ঝুঁকি নেবে না।' আলোচনার পর

পঞ্চানন্দ ও রাখি চলে গেল। মল্লি রয়ে গেল। দূর থেকে দেখতে পেল লক্ষ্মী আর তার বউদি আসছে।

লক্ষ্মী বায়না ধরল মন্দিরে যাবে। সবে এক ছেলে খুন হয়েছে। এখন রাওয়াইরা তাকে একা মন্দিরে যেতে দিতে রাজী নয়। শেষে লক্ষ্মীর সঙ্গে যেতে বলল বউমাকে। দুজনে মন্দিরে এল। মূর্তি যে ঘরে আছে গণাচারি সেই ঘরের তালা খুলে লক্ষ্মীর হাত থেকে প্রসাদ আর ফুলের ডালি নিয়ে নিল। পূজো করল। মূর্তির পেছন দিক থেকে লক্ষ্মীকে দেখার ভীষণ ইচ্ছে হল রাজুর। কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। কারণ তার বৌদি সঙ্গে রয়েছে। লক্ষ্মী সাষ্টাঙ্গে অনেকক্ষণ পড়ে রইল দেবীর সামনে। তারপর যখন উঠল তখন তার চোখে কোন ভাষা নেই। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। রাজু মল্লম্মার হাতের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্মীর এই অবস্থা দেখে চঞ্চল হয়ে উঠল। লক্ষ্মীর ওরকম ভেজা ভেজা নিস্তরঙ্গ চোখ রাজু কোনদিন দেখেনি। তার চেহারার ঐ অবস্থা দেখে গণাচারি বলল, 'ভেবনা মা, সময় মত মল্লম্মার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে।' তার হাতে ডালি দিয়ে, গণাচারি বলল, 'সুদিন আসবেই মা। কোন চিন্তা করো না।'

'সুদিন আর আসবে না বাবা। ভাল লোক যখন বদলা নিতে একেবারে খুন করতে আরম্ভ করেছে তখন আর সুদিনের আশা কোথায় বাবা?' বলে সে চলে গেল।

রাজুর ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে তাকে বলতে, 'আমি খুনী নই! আমার কথা বিশ্বাস কর!' তার মন ছটফট করতে লাগল।

রাজু তাড়াতাড়ি ঐ কুটোর কাছে এসে 'মল্লি' বলে ডাক দিল। ডাকটা এত জোরে হয়ে গেল যে মল্লি চমকে উঠল। চারদিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকানোর মত তাকিয়ে কুটোর কাছে এসে বলল, 'মল্লি, আস্তে কথা বল। বাইরে অনেক লোক আছে।'

রাজু স্বর নামিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'লক্ষ্মীদির সঙ্গে? অন্য জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখন লক্ষ্মীদি শত্রু পক্ষের মেয়ে। তার সঙ্গে রাজু কি দেখা

করতে পারে?' বলল মল্লি।

'ও যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক, যেখানে ইচ্ছে সুখে থাকতে পারে থাকুক। আমি ওকে পরিষ্কার জানাতে চাই যে আমি এই খুন করিনি। সে যেন তা বিশ্বাস করে।' বলল রাজু।

'আমি গিয়ে বলে দেবখন।' বলল মল্লি।

'না, তোমার বললে হবে না। রাত্রে ওকে নিয়ে এস এখানে যে-কোন ভাবে। মরণমার সামনে না বললে সে হয়ত বিশ্বাস করবে না।'

মল্লি কোন কথা বলল না।

'মল্লি, লক্ষ্মীকে তুমি যদি না আন, তাহলে আমি এই মন্দিরেই মারা যাব।' বলল রাজু। মল্লি কিছুক্ষণ ভেবে, 'ঠিক আছে।' বলে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেল।

পান্নালু পা পোড়া বিড়ালের মত ছোট্ট একটা টিনের ছাউনিওলা ঘরে দ্রুত চলাফেরা করছে। অনেক উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা আছে। বহু কষ্টে উপরে উঠে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবতে লাগল—কত কথা—রজার কথা, রাজুর কথা, পুল্লি আর রাবির কথা। ওদের কথা চিন্তা করার এত বেশি সময় কোন দিন সে পায়নি। অদূরে বটগাছের নিচে বসে তাকে পাহারা দেবার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল তারা তাস খেলছিল আর মাঝে মাঝে ঐ ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ তার কানে গেল পুল্লির কান্না। প্রথমে স্বপ্নের মত লাগলেও পরক্ষণেই সেই ভুল ধারণা কেটে গেল! দূরে লক্ষ্য করল পুল্লিকে দুজন ধরে রেখেছে। সে আর্তনাদ করছে। সমুদ্রের গর্জনকেও যেন সেই আর্তনাদ হার মানায়। দুজন গুণ্ডা তাকে ধরে ঐ ঘরের কাছে আনল। 'দেখ, একদম চুপ কর। আর চিৎকার করেছ কি একেবারে মেরে ফেলব।' বলল ওদের একজন।

'না, আমি নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করব না। করণমের লোককে আমি বিশ্বাস করি না।' বলল পুল্লি।

'দেখ, চেঁচিয়োনা বলে দিচ্ছি। তুমি আমাদের চেন না। একেবারে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।' অন্য গুণ্ডা বলল।

ঐ ফুটো দিয়ে এসব ব্যাপার লক্ষ্য করে পান্দালু ভাবল, পুল্লি যখন এত বুক চাপড়ে কাঁদছে তখন নিশ্চয় বুড়ত্তাকে ওরা মেরে ফেলেছে। অথবা অন্য কোন কারণ আছে। এসব ভেবে সে চিৎকার করে সেখান থেকেই বলল, 'ওরে গুণ্ডার দল, ওর গায়ে হাত দিলে তোদের কাঁচা চিবিয়ে ফেলব।'

পান্দালুর গলা পেয়ে পুল্লি, 'বুড়ত্তা, বুড়ত্তা' বলে চিৎকার করল।

তার চিৎকার শুনে পান্দালু ভাবল বুড়ত্তাকে বুঝি মেরে ফেলেছে। তক্ষুনি শুনতে পেল পুল্লি বলছে, 'আমি নিজের চোখে আমার কত্তাকে দেখতে চাই, বুড়ত্তাকে দেখতে চাই। না দেখালে আমি এখানেই মরে যাব।' পুল্লি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

তার চিৎকার শুনে গুণ্ডারা একটু ঘাবড়ে গেল। ততক্ষণে পান্দালু বলল, 'বুড়ত্তাকে কোথায় রেখেছ? আমাদের দুজনকে দেখাতে হবে বুড়ত্তা কোথায়। তা না হলে আগুন জ্বলে যাবে। তোমাদের সেই আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।'

গুণ্ডারা তার কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গেল। ভাবল এত হৈ চৈ চিৎকার শুনে ক্ষেতের কৃষকরা কৌতূহলী হতে পারে। একবার যদি ওরা এদিকে আসে তাহলে আর রক্ষা নেই।

'ওরে এই মীর, তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবুকে খবরটা দিয়ে আয়। যা সব এখানে ঘটছে সব বলে, কি করতে হবে, জেনে আয় তাড়াতাড়ি। ...ওরে এই পান্দালু, চিৎকার করো না। অপেক্ষা কর। এই একটু অন্ধকার হলেই বুড়ত্তাকে দেখতে পাবে। এর পরেও যদি তোমাদের দুজনের মধ্যে কেউ চিৎকার বা কান্না কাটি কর তাহলে তোমরা বুড়ত্তাকে আর এ জন্মে দেখতে পাবে না। চুপ করে থাকবে।' একথা বলে ওরা আবার তাস খেলতে বসে গেল।

পাদ্দালু ও পুল্লি চুপ করে রইল। মীর অনেকক্ষণ হলো চলে গেছে। পুল্লি গাছের নিচেই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

রাওয়াইয়া আরাম কেদারায় বসে ভাবছে। রজার রহস্যজনক মৃত্যুর কারণ তার কাছে পরিষ্কার নয়। গভীর রাত্রে রজাকে একা পেয়ে রাজু উত্তেজিত হতে পারে কিন্তু একটা খুন করা, হত্যা করা কি অত সহজ! আর ও যদি হত্যা করে থাকে, মৃতদেহ নিজের পাহারা-ঘরে রাখবে কেন? তাছাড়া রজাই বা অত রাত্রে রাজুর পাহারা-ঘরের বেড়া টপকে গেল কেন? ধর্মরাজু ও ভেঙ্কান্না জানাল ক্ষেত দেখতে নাকি রজা গিয়েছিল। বেড়ার এপাশ থেকে রাজু জোর করে নিজের ক্ষেতে তাকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে! দূর থেকে ভেঙ্কটেশ ও পোতরাজু তা দেখে বেড়া টপকে গিয়ে দেখে পাহারা-ঘরে রাজু তাকে খুন করে পাশে বসে আছে। ধর্মরাজু এই ঘটনার বিবরণ না দিয়ে অন্য কেউ দিলে রাওয়াইয়া তার অনেকখানি বিশ্বাস করত। কিন্তু ধর্মরাজু যেহেতু আছে সেহেতু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে —বিশেষ করে যতদিন দুই পরিবারে ঝগড়া আছে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। রাজু তাহলে পালাল কেন? রাজুর লোকজন, বিশেষ করে পাদ্দালু কোথায়? রাজু যদি কিছু না করে থাকে তাহলে পুলিশকে পরিষ্কার বলে দিলেই তো পারে! এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

সদর দরজার কাছে ছেলের চিৎকার কানে যেতেই রাওয়াইয়ার চিন্তায় ছেদ পড়ল। ছুটে গেল সেদিকে। মল্লির দুটো হাত ধরে রয়েছে ভেঙ্কান্না। মল্লি নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

'কি হচ্ছে?' বলল রাওয়াইয়া।

ভেঙ্কান্না মল্লির হাত ছেড়ে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'চোখের দেখা নাকি দেখতে এসেছে···খানকির বাচ্চা!' হঠাৎ রাওয়াইয়ার থাপ্পড় পড়ল ভেঙ্কান্নার গালে। বিয়ের পর সে কোন দিন বাপের হাতে মার খায়নি।

'পাজি, বদমাইস কোথাকার! অভিজাত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় জান না!' রাওয়াইয়া বলল।

'কাকীমা আর লক্ষ্মীদিকে দেখতে এসেছি। কেমন আছে দেখবো না?' বলল মল্লি। মুখ তুলে প্রাপ্তিক দৃষ্টিতে তাকাল মল্লি। তার চোখে জল দেখে রাওয়াইয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। মল্লি যে কোমল মনের মেয়ে তা সে কেন, সবাই ভাল ভাবেই জানে। আর লক্ষ্মীকে মল্লি যে কত গভীর ভাবে ভালবাসে তাও অজানা নয়। তবু তার সামনে ছেলেকে মারা ঠিক হয়নি। এতে যে শুধু তার ছেলের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে তাই নয় নিজেরও হয়েছে। মল্লি এক পা, এক পা করে বাড়ির দিকে ফিরে যাওয়ার সময় রাওয়াইয়া বারণ করতে পারল না।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী এসব দেখছিল। মল্লি চলে যাচ্ছে দেখে লক্ষ্মী চিৎকার করে ডাকল, 'মল্লি।' মল্লি থামল। মুহূর্তে যেন উড়ে এল লক্ষ্মী। মল্লির কাঁধে হাত দিয়ে 'এস', বলে বাপের দিকে একবার তাকিয়ে মল্লিকে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতরে। তার সেই চাউনি দেখে রাওয়াইয়ার মনে হল যেন সে বলছে, 'তোমরা পুরুষরা শুধু ঝগড়া করতেই পার।'

দোতলার ব্যালকনিতে বসল মল্লি ও লক্ষ্মী অনেকক্ষণ। যে যার চিন্তায় মগ্ন ছিল। মনের কথা কেউ পাড়তে পারল না। রাজার খুনের ব্যাপারে কথা বলতে চায় মল্লি। আবার মল্লিকে যে তার দাদা অপমান করেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে চায় লক্ষ্মী। শেষে লক্ষ্মী বলল, 'আমার বিয়ের ব্যাপারে এদিকে কি ঘটেছে শুনেছ?'

'বাওয়া আমাকে বিয়ে করবে বলেছে।' বলল মল্লি।

'ভালোই তো।' লক্ষ্মী বলল। পরক্ষণেই মনে পড়ল যে রাজুর মাথায় খুনের কেস ঝুলছে। ভাবল মল্লির কপালে শেষে একজন খুনী জুটল!

'এই সব খুন-খারাবির আগেই, আমি বাওয়াকে বিয়ে করবো না, বলে দিয়েছি।' বলল মল্লি।

লক্ষ্মীর বুক ধড়ফড় করে উঠল। সে ভাবল, মল্লি গররাজি হল কেন? সে কি তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছে? মল্লি কত সহজে পরের জন্য

ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু তার সন্দেহ বা রাজুর বিয়ে হবে কি করে? বিশেষ করে রূপার খুন হবার পর?

'দিদি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। রাখতে হবে। রাত দশটার সময় তুমি মন্দিরে এসো। আসতেই হবে।' মল্লি বলল।

'রাত্রে! মনসার মন্দিরে?'

'দিদি, তোমার কোন ক্ষতি হবা'র আগে আমার হবে। তোমাকে বাঁচাতে আমার জীবন দেব।'

কথাটা বলেই মল্লি উঠে দ্রুত নেমে গেল। তার কর্তব্য শেষ। লক্ষ্মীর মনে যতই সংশয় ও সন্দেহ থাক, ও যেভাবে জোর দিয়ে বলেছে, তাতে সে যাবেই। মল্লির মনটা একটু ঠাণ্ডা হল।

একতলায় নেমে এসে সে গেল দক্ষিণ দিকের ঘরে। ঐ ঘরে শুয়ে রয়েছে সুরালু। মল্লিকে এগিয়ে দিতে লক্ষ্মী এলো না। সুরালুকে দেখে মনে হল সে যেন বিরাট এক ঝড়ে বিধ্বস্ত। আস্তে আস্তে গিয়ে সে পাশে বসল। তাকে দেখেই লক্ষ্মীর বৌদি, শাশুড়ীর মাথার কাছ থেকে উঠে, মুখ ঘুরিয়ে নিল। চোখ মুখের এমন ভাব করল যাতে প্রকাশ পায়, মল্লিকে সে ঘৃণা করে। মল্লির যেন কোন শত্রু নেই। 'কত রোগা হয়ে গেছ, কাকীমা?' বলল মল্লি। তাকে দেখেই সুরালুর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। মল্লি তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'মা মনসার এই গ্রামের উপর আর বোধ হয় দয়া মায়া নেই। আরও কতজন যে মরবে কে জানে!' বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মল্লি উঠে পড়ল। ততক্ষণে লক্ষ্মী এল। মল্লির ওঠার পর সে যেখানে বসে ছিল সেই খানে বসল। না জানি কেন, লক্ষ্মীর খুব হালকা লাগছে। রাওয়াইয়া গাড়ি করে শহরের দিকে রওনা হল। রাজুর ট্রাক্টর পোড়ার কেসে তার নাম জড়িয়েছে রাজুর এ্যাডভোকেট। ধর্মরাজ ও জোরাবা কি একটা কাজ আছে বলে তার সাথে গেল না।

দিন দুপুরে মাজির ঘরে ধর্মরাজ ও জোরাবার বৈঠক এই প্রথম।

সবাই জানে, সবাই বোঝে, কেউ তা নিয়ে আলোচনাও করে না। তবু ঘটনাটা রাত্রে হত বলে কেউ প্রকাশ্যে তা নিয়ে কিছু বলত না। মাজির ঘরে রাত্রে লোক যাবে এটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু দিন দুপুরে বৈঠক বসাতে গ্রামের একটা অলিখিত নিয়ম যেন ভঙ্গ হল। মাজির ঘরে দিন দুপুরে জরুরী সভা না ডেকে উপায় ছিল না ধর্মরাজুর।

পাঙ্গালু, পুন্নি, বুড়তাকে দেখার জন্য খুব চেঁচামেচি করছে। সেই রাত্রেই যদি বুড়তাকে না দেখানো হয় তাহলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। গুণ্ডা দলের খবর আনল মীর। মীরকে দেখেই ধর্মরাজুর ভয় হল। কারণ ধর্মরাজু গুণ্ডাদের সঙ্গে ভেঙ্কান্নার আলাপ যাতে না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে। গুণ্ডাদের যত টাকা দিয়েছি বলে ধর্মরাজু ভেঙ্কান্নার কাছে আদায় করেছে তত টাকা তাদের সে দেয়নি। আর যে টাকা ওদের হাতে দিয়ে আসতে লিঙ্গরাজু কে পাঠিয়েছিল সে বোধ হয় তার থেকে কিছু টাকা নিজের খরচের জন্য মেরে দিয়েছে।

সেদিন লিঙ্গরাজুকে ঘর থেকে বের করে দেবার সময় ধর্মরাজু হাজির হয়ে প্রথমে ঝোঁড়িয়ে শেষে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠাণ্ডা করল তাকে। পাথর বসানো কানের দুল দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও সে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, পাথর বসানো দুল দেখিয়ে ভেঙ্কান্নাকে মাজি বলল, 'এই দেখছেন, এই দুল করণম্ মশাই আমাকে দিয়েছে।'

মুহূর্তে ধর্মরাজুর মুখ শুকিয়ে গেল। এই ধরনের একটা দুল দেবার প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল বটে কিন্তু সে তো তা দেয়নি। ধর্মরাজু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাজির দিকে তাকাতেই সে বলল, 'অমন করে কি দেখছ, আমাকে মানাচ্ছে না? কেন, নিজে হাতে করে দিয়ে যেতে পারলে না? ওইটুকু ছেলের হাতে দিয়ে পাঠাতে হয় সোনার জিনিস?'

সেই মুহূর্তেই ধর্মরাজু বুঝল লিঙ্গরাজু পুরো টাকা গুণ্ডাদের হাতে দেয়নি। টাকাগুলো মাজির জন্য খরচ করেছে।

মাজির ঘর বাদে অন্য কোন জায়গায় বসতে পারলে হয়ত অন্য দিক

থেকে ভাল হত কিন্তু ধর্মরাজুর বিশ্বাস ছিল মাভি কারো কাছে কোন গোপন কথা ফাঁস করবে না।

ভেঙ্কাম্মা, ধর্মরাজু ও মীর অনেকক্ষণ আলোচনা করল। বুড়ভাকে এখন না দেখালে পুল্লি ও পাদ্দালু ঠিক ভাববে যে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তা নিয়ে বুক চাপড়ে পুত্র শোকে পুল্লি কেঁদে ভাসাবে। জানাজানি হয়ে যাবে। শেষে গোটা ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে ধর্মরাজুকে এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। কারণ রাজু যে খুন করেনি তার একমাত্র সাক্ষী পাদ্দালু।

'পাদ্দালুকে মেরে ফেলে ঐ খানেই পুঁতে ফেলব?' মীর জিজ্ঞেস করল। একটি জীবন নেওয়া মীরের কাছে এমন কোন ব্যাপার নয়। তবে অবশ্য অহেতুক কারো জীবন নিতে সেও চায় না। কারণ তার ঝামেলা যে কত খানি তা সে ভাল ভাবেই জানে। তার অনুচরদের দোষে তিন তিনবার তাকে জেল খাটতে হয়েছে। দাগী আসামী সে এখন। জেলে বসে সে প্রতিজ্ঞা করেছে ঐ অনুচরদের জেল থেকে বেরিয়ে তাদের খুঁজে খুঁজে শাস্তি দেবে, কিন্তু দিতে পারে নি। তবু এই ধরনের কথা না বললে সে যে গুণ্ডা তা প্রমাণই বা হয় কি করে।

কিন্তু পাদ্দালুকে হত্যা করতে ধর্মরাজু ও ভেঙ্কাম্মা রাজী হল না। কারণ পুল্লি পাদ্দালুর গলা পেয়েছে। তাকে দেখেছে। এখন হঠাৎ না দেখতে পেলে পাড়া মাথায় করে আর্তনাদ শুরু করে দেবে। অনেক কথার পর ঠিক হল ঐ দিন রাত্রেই বুড়ভাকে নিয়ে গিয়ে পুল্লি ও পাদ্দালুকে দেখানো হবে।

লক্ষ্মী ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভাবছে মল্লির কথা। এক মুহূর্তের জন্যেও যেন সে তাকে ভুলতে পারছে না। মন্দিরের কাছে কি হবে? অন্ধকারে বা গভীর রাত্রে যে কোন দিন সে বেরোয়নি তা নয়। রাজুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছে। কিন্তু আজ রাজুর সঙ্গে দেখা হবে কি? না মল্লি অন্য কোন কারণে ডেকেছে? এর সঙ্গে রাজুর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যদি সে এসে যায়? কি হবে? হঠাৎ রাজু এসে যদি বলে, 'চল আমার সঙ্গে।' তখন ওকি যেতে পারবে? যাওয়ার উপায়

আছে তার ? যাই হোক, মল্লি যেহেতু ডেকেছে তাকে সেহেতু যেতেই হবে। অবশ্যই যেতে বলেছে যখন, তখন যেতেই হবে। যাই হোক, না কেন সে যাবে। দশটা বাজতে আর দেরি নেই। এখনও পাতকুয়োর কাছে কেন যে তার দাদা ভেজ্জান্না দাঁড়িয়ে আছে ভেবে পেল না লক্ষ্মী। কিছুক্ষণ পরে ভেজ্জান্না সেখান থেকে সরে গেল। কোথায় যে গেল কে জানে। মল্লির ডাকের সঙ্গে ভেজ্জান্নার যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, লক্ষ্মী ভেবে পেল না। বেছে বেছে মন্দিরের কাছেই বা তাকে ডাকল কেন মল্লি ? রাজুর বিপদ হলে মল্লি স্থির থাকতে পারে না। কেন জানি বারবার মনে হতে লাগল মল্লির এই ডাকের সঙ্গে রাজুর সম্পর্ক রয়েছে। তা হলে তার দাদা গেল কোথায় ? মল্লির কথা কি ভেজ্জান্না শুনেছে ? হঠাৎ মল্লি আজ মন্দিরের কাছে রাজুর সঙ্গে ভেজ্জান্নার দেখা হয়ে যায় ?

পরিচিত সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামল লক্ষ্মী। বারান্দায় দাঁড়াল। পাহারাদার পোতুকে দেখা যাচ্ছে না। বাবা শহরে গেছে, এখনও ফেরেনি। তার দরজাটাও খোলা রয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখে চাক চাক আলকাতরা—যে দিকে তাকায় ঘন অন্ধকার। তার খালি মনে হতে লাগল এই অন্ধকারে যদি রাজুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ! তখন সে কি করবে ? লক্ষ্মীর মন পেছচ্ছে কিন্তু তার পা এগোচ্ছে।

মন্দিরের পেছনে বিরাট এক তেঁতুল গাছ। সেই গাছের নিচে, ঘাপটি মেরে, বসে রয়েছে গঙ্গাম্মা আর রাবি। ওরা পাহারা দিচ্ছে। শহর থেকে যারা গ্রামে ঢোকে তাদের ঐ রাস্তা দিয়েই গ্রামে ঢুকতে হয়। গঙ্গাম্মা রাবির গা ঘেঁষে বসে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগল। রাবিও সরছে না। মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা তার কাছে মন্দ লাগছে না। গঙ্গাম্মা রাবিকে বুকে টেনে নিল। রাবি বলল, 'কি গো, তোমার সাহস তো খুব।' বলল কিন্তু নিজেও সরল না। কথাটা কানে যেতেই গঙ্গাম্মার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আবেগে আনন্দে সে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ঘেমে নেয়ে একাকার।

'এই কে যেন আসছে।' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল রাবি।

গঙ্গাম্মার ভেতরে যেটুকু আবেগ ছিল তা এক চাক বরফ হয়ে গেল। কে যেন ছুটে ছুটে আসছে। গঙ্গাম্মা এগিয়ে যেতে চাইল। রাবি তাকে পেছনের দিকে টেনে ধরে বলল, 'লক্ষ্মী আসছে।'

মন্দিরের দরজা খোলা ছিল। লক্ষ্মী সোজা ভিতরে ঢুকে গেল। মল্লি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

'এস', বলে লক্ষ্মীকে ধরে মল্লি মল্লম্মার দেবী-মূর্ত্তি যেখানে ছিল সেখানে নিয়ে গেল।

রাজু মূর্ত্তির পেছন দিক থেকে এল। বড় প্রদীপের উজ্জ্বল আলোতে লক্ষ্মী রাজুকে দেখে থ বনে গেল। একে অন্যের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কারও মুখে কথা সরল না।

'লক্ষ্মী', বলে রাজু তাকে কাছে টেনে নিল। মল্লি লক্ষ্মীর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

'বিশ্বাস কর লক্ষ্মী, রঙ্গাকে আমি খুন করিনি। ও কি ভাবে খুন হয়েছে জানিনা। পাহারা-ঘরে ঢুকে দেখি রঙ্গা খুন হয়ে পড়ে আছে।'

লক্ষ্মী কোন কথা বলল না। রাজুর দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। রাজু যে রঙ্গাকে খুন করেনি, তা সে বিশ্বাস করে। কিন্তু তারপরেও তার মনে একটি প্রশ্ন থেকে যায়।

'লক্ষ্মী', বলে রাজু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সেই মুহূর্তে সেখানে যে মল্লি আছে, গণাচারিও যে ইতি মধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে—সেদিকে তাদের খেয়াল ছিল না। একে অন্যের চুলে, পিঠে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলোতে লাগল এবং কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ তাদের খেয়াল হল যে তারা দেবী মল্লম্মার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেরই একটু লজ্জা করল। রাজু লক্ষ্মীকে একটি পাথরের উপর বসিয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার জানাল। এমতাবস্থায় সে কি করতে যাচ্ছে তাও জানাল তাকে। এতক্ষণে লক্ষ্মীর যেন সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা হল। এই রাত্রে ঠিক মত সব কাজ না হলে অনেকেরই জীবন বিপন্ন হবে। পাদ্দালু, পুল্লি, বুড়ডা, এমন কি তার দাদা ভেঙ্কান্নারও বিপদ হতে পারে। লক্ষ্মী মল্লম্মার সামনে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সকলের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করল।

'এখন আমাকে যেতে হবে, লক্ষ্মী!' বলল রাজু।

'একটু দাঁড়াও।' বলে লক্ষ্মী গণাচারির দুই হাত ধরে বলল, 'আপনি আমাদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দিন। সাক্ষী মা মল্লম্মা!'

'তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি ফিরে আসব এক্ষুনি।' রাজু বলল।

গণাচারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এভাবে সে মন্ত্র পাঠ করে বিয়ে দিলে, গ্রামের দুটো মাথা তাকে ছিঁড়ে খাবে। কারণ এসব ব্যাপার ঢাকা থাকবে না। তাছাড়া লক্ষ্মীর জন্য আলাদা পাত্র ঠিক হয়ে গেছে। গোটা গাঁয়ে টি টি পড়ে যাবে। লক্ষ্মীরও যে বিপদ নেই তা নয়। অস্থির হয়ে লক্ষ্মী গণাচারিকে বলল, 'অত আপনার ভাববার কিছু নেই। মন্ত্র পাঠ করুন।'

গণাচারি রাজুর দিকে তাকাল। তার দিকে তাকিয়ে বুঝল তারও খুব একটা ইচ্ছে নয় যে তাদের বিয়ে সেই মুহূর্তে হোক।

'আমার কথা শোন লক্ষ্মী, মা মল্লম্মার দয়ায় সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। আমাদের মিলন হবেই।'

'ওগো না, আমার মন বলছে আর আমাদের জীবনে সুদিন আসবে না। এক্ষুনি বিয়ে হয়ে যাক।'

'তোমাকে তো বলেছি আমরা কি কাজে যাচ্ছি। এ কাজে মস্ত বড় বিপদ আছে!'

'সেই জন্যই চাইছি, এক্ষুনি হোক, এই মুহূর্তে!'

অগত্যা রাজু রাজী হল। গণাচারিকে ইশারায় তার মত জানিয়ে দিল। গণাচারি বলল, 'মঙ্গল সূত্র ইত্যাদি তো নেই।'

'সুতো আছে, হলুদও আছে। এতে হবে না?' মল্লি বলল।

গণাচারি মল্লির জ্ঞান বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেল। মন্ত্রপাঠ করে মল্লির পাকানো সুতোতে হলুদের টুকরো বেঁধে সেই মঙ্গল সূত্র রাজুর হাতে দিল। রাজু গণাচারির উচ্চারিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে লক্ষ্মীর গলায় মঙ্গল সূত্র বেঁধে দিল।

নবদম্পতি প্রথমে দেবী মল্লম্মাকে পরে গণাচারিকে প্রণাম করল।

পশাচারি প্রাণ ভরে ওদের আশীর্বাদ করল। তারপর লক্ষ্মী মল্লিকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে।

'বাওয়া, এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।' বলল মল্লি।

'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।' লক্ষ্মী বলল।

'তুমি গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। কারণ হঠাৎ সেখানে তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। লক্ষ্মীটি, তুমি এসো না। তুমি এখন বাড়ি যাও।' রাজু বলল।

'এই রাত্রে আর আমি বাড়ি ফিরবো না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবো না। তোমরা নিরাপদে ফিরে এসো।'

রাজু, মল্লি রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে জুটল রাবি ও গঙ্গাপ্পা।

'গাড়িটা থাকলে কত সুবিধে হতো এই সময়!' বলল ধর্মরাজু।

'বাবা যে এত দেরি করবে কে জানত!' বলল ভেঙ্কাপ্পা।

গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে ভেঙ্কাপ্পা ও ধর্মরাজু। শহর থেকে জায়গাটা প্রায় ছ মাইল দূরে। রাস্তার দুপাশে আম বাগান। যুদ্ধের সময় এই জায়গাটায় সৈনিক শিবির ছিল। আধ মাইল দূরে পিচ ঢালা পথ। আমবাগানে দশ পনেরটা টিনের ছাউনি আছে। মিলিটারিরা করে গিয়েছিল। সেগুলো ওইভাবেই পড়ে আছে। গ্রীষ্ম কালে আম রাখা হয় সেগুলোতে। ওরই একটি শেডে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বুড়তাকে।

মীর ও আরও দুজন বুড়তার মুখে কাপড় পুরে তাকে শেড থেকে বের করে গাড়িতে বসাল। গাড়িতে উঠে বসল ধর্মরাজু ও মীর। গাড়িটা চলা শুরু করতেই পোতু ছুটতে ছুটতে এল।

'বাবু, মেজবাবু, মন্দিরে কারা যেন কথা বলছে।' পোতু বলল।

'মন্দিরে?' ভেঙ্কাপ্পা জিজ্ঞেস করল।

'মা মল্লম্মার মন্দিরে সমস্ত দরজা বন্ধ করা আছে। মন্দিরের পেছনে তেঁতুল গাছের গোড়ায় বসে রয়েছে গঙ্গাপ্পা আর রাবি।' পোতু বলল।

'ওহে জেহোয়া, আমার মনে হচ্ছে রাজু ওই মন্দিরেই আছে।' বলল ধর্মরাজু।

ইন্সপেক্টর যে দেখল টর্চ নিয়ে?' বলল জেহোয়া।

'যাই হোক, তুমি গিয়ে দেখ। ওরে পোতু, তুই জনা দশেক লোক জড়ো কর। ভাল লোককে জড়ো করবি। রাজু খুব একটা বোকা ছেলে নয়। সোজা পথে ওকে ধরা যাবে না।'

'তুমি তাহলে একা বুড়ভাকে নিয়ে যাবে?' জেহোয়া বলল।

'এ কাজে আর কতজন দরকার? মীর রয়েছে, ভেঙ্কটেশ রয়েছে, পেন্টাইয়া আছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও।' বলে ধর্মরাজু গরুর গাড়ি ছাড়তে বলল। জেহোয়া আর পোতু গাঁয়ের দিকে রওনা দিল।

গাড়িটা অনেক দূরে থাকতেই, 'বাওয়া-আমার বুড়ভা—' বলে ছুটে গেল পুন্নি। কে কি করবে আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সেই জন্যই পুন্নি ছুটল। তিনজন গুণ্ডা তার পেছনে পেছনে ছুটল। ওরা সবাই যখন পুন্নিকে নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে রাজু ঢুকে পড়ল পাপ্পালুকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে। রাজুকে দেখেই পাপ্পালু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠল, 'ছোট কত্তা!' রাজু ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করতে বারণ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন গুণ্ডা পাপ্পালুকে ডাকতে ওই ঘরে ঢুকল। মুহূর্তের মধ্যে ওই দুজনের মাথা ফাটল এবং মাটিতে পড়ে গেল। বাইরের দিক থেকে দরজা বন্ধ করে রাজু আর পাপ্পালু বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে ওই ঘরে যে এতবড় ঘটনা ঘটে গেছে তা টের পেল না ধর্মরাজু। অন্যদিক থেকে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে পেন্টাইয়া ও মীরকে দু হাতে গলা টিপে ধরে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে গেল রাজুর লোক। কি যেন বলতে বলতে ধর্মরাজু নেমে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রাবি তার চোখে ভরে দিল লঙ্কা বাটা গোলা জল। হাউ মাউ করে আর্তনাদ করতে লাগল ধর্মরাজু। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কোনদিকে

যেতে পারছে না। পরমুহূর্তে গঙ্গাম্মার কাছে এসে ওই দুজন গুণ্ডার চোখেও লঙ্কার জল ভরে দিল। পেন্টাইয়া ও মীর গঙ্গাম্মার ধোলাই খেয়ে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল।

পুল্লি তার ছেলেকে কোলে তুলে নিল। অবস্থা দেখে বাকি গুণ্ডারা যে যার ছুটে পালাল। গঙ্গাম্মা গাড়ি হাঁকাতে বসে গেল। পুল্লি, রাবি, মল্লি, বুড়ো গাড়ির ভেতরে বসল। গাড়ি এগোতে লাগল।

রাজু পান্দালুকে বলল, 'পান্দালু, তুমি থানায় চলে যাও। যা ঘটেছে বলে এস। তোমার আর কোন ভয় নেই।'

'ছোট কর্তা, আমি যদি জেলে যাই, পুল্লি আর ছেলে মেয়েরা রইল, দেখো।' পান্দালু বলল।

'ওরে পাগলা, তোমাকে যদি জেলে যেতে হয় আমিও তোমার সঙ্গে যাব। পুলিশ নিয়ে সরাসরি এখানে আসবে। এদের সবাইকে এ্যারেস্ট করাতে হবে। এদের সাক্ষীতেই তুমি বাঁচবে, আমিও বাঁচব।'

তারপর রাজু ও পান্দালু ধর্মরাজু, পেন্টাইয়া, মীর ও ভেঙ্কটেশের হাত পা কষে বেঁধে, একটা শেডে পুরে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

পান্দালু থানার দিকে চলে গেল। আর রাজু পা চালিয়ে গরুর গাড়িটাকে অনুসরণ করল।

ভেঙ্কাম্মাকে আট দশজন লোক নিয়ে হাজির হতে দেখে গণাচারি ঘাবড়ে গেল। মুহূর্তে চার পাঁচজন লোক তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। লক্ষ্মী এসব দেখে অবাক। ভেঙ্কাম্মাও মন্দিরে লক্ষ্মীকে দেখে হকচকিয়ে গেল। লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে মা মল্লম্মার পায়ে পড়ল। ভেঙ্কাম্মা ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে জিজ্ঞেস করল, 'হারামজাদী, তুই এত রাত্রে মন্দিরে কেন এসেছিস? কার জন্য এসেছিস, বল?'

'আমার সঙ্গে যার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল তার কাছে এসেছি। আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। মা মল্লম্মা সাক্ষী।' বলল লক্ষ্মী।

'কি ? বিয়ে হয়ে গেছে ? বিয়ে ! এক্ষুনি যদি তোকে না নিয়ে যাই তো আমার নাম ভেক্কাম্মা নয়।' ভেক্কাম্মা সব কাজ ভুলে তাকে টেনে হিঁচড়ে মন্দিরের বাইরে নিয়ে যেতে লাগল।

'যাব না, যাব না' বলে লক্ষ্মী আর্তনাদ করতে লাগল।

সদর দরজা দিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে টানতে টানতে ভেক্কাম্মার ঢোকার সময় সুরালু মেয়ের আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি করছিস ?'

'কি আর করব ? তোমার মেয়ে রাতের অন্ধকারে মন্দিরে ঢুকে ঐ খুনীকে বিয়ে করেছে।'

'এঁ্যা' বলে সুরালু মূর্চ্ছা যাওয়ার মত পড়ে গেল। 'মা' বলে ছুটে এসে ভেক্কাম্মার বউ লাক্ষ্মীকে ধরল। ভেক্কাম্মা লক্ষ্মীকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ্মী চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মা, দরজা খুলে দাও ! আমি না গেলে আমার স্বামী মরে যাবে !'

লক্ষ্মীর আর্তনাদ সহ্য করতে পারছে না সুরালু। লক্ষ্মী আবার আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'বৌদি, একটু দয়া কর, দরজা খুলে দাও ! তুমি কি চাও যে আমি বিধবা হই ? স্বামী মারা গেলে মেয়েদের জীবনে আর কী থাকে ? বৌদি তোমার পায়ে পড়ি, দরজা খুলে দাও।'

লক্ষ্মীর বৌদি ভেক্কাম্মাকে খুব ভয় করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার আর কোন কিছুতেই ভয় হলো না। দরজা খুলে দিল। খাঁচা থেকে মুক্ত পাখির মত উড়ে গেল লক্ষ্মী।

গরুর গাড়ি মন্দিরের কাছে যখন এল তখন ভোর হয়ে এসেছে। পূর্বাকাশে অন্ধকার কেটে যাচ্ছে রক্তিম আলোর ছটায়। রাজু গঙ্গাম্মাকে বলল, 'তুমি এক কাজ কর। পুলি, রবি আর বুড়োকে

ওদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে এস।' মল্লি গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি এগিয়ে গেল।

মন্দিরের দরজা খুলেই রাজু স্তম্ভিত হল। গণাচারি থামের সঙ্গে বাঁধা! তার মুখে কাপড়ের পুঁটলি পুরে দেওয়া হয়েছে। মা মল্লম্মার ঘরের দরজাও খোলা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মল্লি গণাচারির দড়ি খুলতে লাগল। গণাচারির মুখ থেকে কাপড়ের পৌটলাও বের করল।

'রাজু, তুমি ভেতরে ঢুকবে না। এর ভেতরে দশজন গুণ্ডা আছে।' গণাচারির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দশজন লোক এসে রাজুকে জাপটে ধরল। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ভেঙ্কাম্মা দেখছে। রাজু ওদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে একটু সরতে না সরতেই মল্লি দেখতে পেল ভেঙ্কাম্মা মস্ত বড় একটা পাথরের চাঁই দুহাতে ধরে ছুঁড়ছে। মুহূর্তে মল্লি রাজুকে ঠেলে সরিয়ে দিল। পাথরটি মল্লির মাথায় পড়ল। পরমুহূর্তে মল্লি কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভেঙ্কাম্মাকে আর দেখা গেল না। ভেঙ্কাম্মাকে দেখতে না পেয়ে, মল্লির রক্তাক্ত অবস্থা দেখে, গুণ্ডারা কেটে পড়ল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল লক্ষ্মী। 'মল্লি' বলে আর্তনাদ করে লক্ষ্মী মল্লির কাছে বসে পড়ল। কি যে ঘটে গেল রাজুর পক্ষে বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। মল্লির মাথাটাকে নিজের কোলে রাখল রাজু। তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। সে 'মল্লি' 'মল্লি' বলে কাঁদতে লাগল।

ভেঙ্কাম্মা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে! কি যে ঘটে গেছে তাও সে ভেবে পাচ্ছে না। তাদের গরুর গাড়ি থেকে মল্লি নামল কেন? সেই গাড়িতে রাবি, পুল্লি, বুড়ভাই বা রইল কেন? ধর্মরাজু মীর পেন্টাইয়া সব গেল কোথায়? তাহলে কি, যে ভাবে যা হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি? রাগে ফুলতে ফুলতে সে উঠে পড়েছিল মন্দিরের পাঁচিলের ওপর। সেখান থেকেই সে ছুঁড়ে মারল পাথরটা।

বাপকে শহর থেকে ফিরতে দেখল ভেঙ্কাম্মা। বাবা সব জেনে যাবে ভেবে সেখান থেকে ছুটে পালাল সে। গাড়ি কাছাকাছি আসতেই

গণাচারি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রাওয়াইয়াকে গাড়ি থামাতে অনুরোধ করল। গণাচারিকে এতখানি উদ্বিগ্ন রাওয়াইয়া কোনদিন দেখেনি। গণাচারি বলল, 'রাওয়াইয়া বাবু, তাড়াতাড়ি আসুন। দেখুন, কি হয়েছে! এক্ষুনি গাড়ি করে নিয়ে না গেলে মল্লিকে বাঁচানো যাবে না।'

'কাকে?' জিজ্ঞেস করল রাওয়াইয়া।

'মল্লিকে!'

'মল্লিকে?'

রাওয়াইয়া দেখল রাজুর কোলে মল্লির রক্তাক্ত মাথা! রাজু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মামা, (তেলুগু ভাষায় শ্বশুরকেও মামা বলা হয়) আমাদের ঝগড়া বিবাদের বলি হল মল্লি।'

'মামা' ডাক শুনে রাজুর উপর রাওয়াইয়ার সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল। লক্ষ্মী সকাতর দৃষ্টিতে তাকাল বাপের দিকে। 'বাবা, তুমি, আমি দাদা সবাই মিলে দেবকন্যার মত মেয়ে মল্লিকে মেরে ফেলেছি।' লক্ষ্মী কাঁদতে কাঁদতে বলল।

স্তম্ভিত হয়ে মাথা নিচু করে মল্লির দিকে তাকাল রাওয়াইয়া। হঠাৎ ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বলল, 'ওরে, তোরা কি দেখছিস! আমার মল্লি মাকে তোল গাড়িতে!'

'না আমি আর বাঁচব না—আমাকে এখানেই মরতে দাও—' ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল মল্লি। রাজু বাচ্চা ছেলের মত কাঁদতে লাগল।

'না মল্লি, তোমাকে আমরা মরতে দেব না! তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই!' লক্ষ্মী বলল।

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি ফুটে উঠল মল্লির। পরক্ষণেই ক্ষীণ কণ্ঠে মল্লি বলল, 'আমাকে মল্লম্মার কাছে নিয়ে যাও।'

রাজু মল্লিকে নিয়ে মল্লম্মার মূর্তির সামনে বসল।

'দিদি, বুকটা ভার হয়ে গেছে।' মল্লি বলল।

লক্ষ্মী মল্লির বুকে হাত বুলোতে গিয়ে সেই চিঠিগুলো পেল। মল্লি টের পেয়ে বলল, 'এগুলো বাওয়ার জন্য!'

রাজু 'মল্লি মল্লি' বলে পাগলের মত কাঁদতে লাগল।

গঙ্গাম্মা এসে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মল্লির চোখের তারা সকলের দিকে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে রাওয়াই-য়ার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল, 'কাল রাত্রে মা মল্লম্মার সামনে-রাজু-বাও-য়ার-সঙ্গে-লক্ষ্মীদির বিয়ে হয়ে-গেছে। তুমি ওদের আশীর্বাদ করো।'

রাওয়াইয়া মল্লির হাত নিজের হাতে রেখে এমন-ভাবে বসে রইল যেন সে মল্লির নির্দেশ মত কাজ করতে রাজী আছে। মল্লির চোখের তারা মা মল্লম্মার দিকে ঘুরে স্থির হয়ে গেল।

সুব্বাইয়া, পুন্নাইয়া, শেষাম্মা, সুন্দরাম্মা সবাই ছুটতে ছুটতে এল মন্দিরে। গণাচারি ইশারায় দেখিয়ে দিল মল্লিকে। সবাই একসঙ্গে 'মল্লি' বলে আর্তনাদ করে উঠল। গণাচারি আপন মনে বলল, 'মল্লি, মল্লম্মার মধ্যে লীন হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যেই মল্লম্মা যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করে। আমাদের ভুলের জন্য তাকে বলি হতে হয়। একদিন না একদিন মানুষ নিজের ভুল বুঝবেই। তারা তাদের মাকে চিনতে পারবেই।'

+ +